হাওয়ার দাঁড়ি

লীলা মজুমদার

ঋতম্ ॥ সোনারপুর ॥ ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

প্রথম
সংস্করণ :
১লা বৈশাখ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

অলংকরণ :
অশোক গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক :
তাপস কুমার চক্রবর্তী
খিরিশতলা, সোনারপুর
২৪ পরগণা (দক্ষিণ)

প্রাপ্তিস্থান :
কথা ও কাহিনী (বুক সেলার্স) প্রাইভেট লিমিটেড
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীবিজয় চক্রবর্তী
মুদ্রণায়ন
৩৭/৯ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লীলা মজুমদার ছোটদের গল্পের জগতের সম্রাজ্ঞী। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বিজ্ঞান আর কল্পনা, আনন্দ আর উৎকণ্ঠা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে আসে তাঁর গল্পে। প্রতীকের সিঁড়ি বেয়ে মানবিকতাবোধের এক আশ্চর্য উপলব্ধিতে উত্তরণ ঘটে ছোটদের। অথচ প্রকাশভঙ্গি কোথাও এতটুকু গুরুগম্ভীর নয়, একেবারে হাল্‌কা চালে বলা, যেন তাঁর সামনে বসে তাঁরই মুখে শুনে চলেছি গল্প···

'হাওয়ার দাঁড়ি' সঙ্কলনটিতে ঐ নামের একটি বড় গল্প ও 'ঘুড়ি' নামে একটি ছোট গল্প সঙ্কলিত হল। ভিন্ন স্বাদের হলেও গল্প দুটিতে কোথায় যেন একটা আশ্চর্য মিল। ছোটদের ভালো লাগার মধ্যেই এই গ্রন্থের সার্থকতা।

—প্রকাশক

হাওয়ার দাঁড়ি

গাঁটিকে এরা বলে বনগাঁও।

মংলু, মুংরি, বুধন, বুধো, মাধো, চম্পা, টেমি, গুঁপো, ল্যাংড়া এরা সবাই বনের মানুষ। নেংটি পরে থাকে। খালি শীতকালে ছেঁড়া কম্বল গায়ে দেয়। না জানে লিখতে পড়তে, না পারে হিসেব কষতে। আঙুলের ডগায় দশের বেশি গুণতে জানে না। দশ আঙুলে হল গিয়ে দশ; দশ লেখে একটা দাঁড়ি। বনদেওয়ের থানের বাঁধানো পাথরে দাগটি কাটা হয়। সেখানে কেউ চালাকি করতে সাহস পাবে না। বেঁটে দাঁড়ি হল গিয়ে পাঁচ। দশটা বড় দাঁড়িতে হয় একশো। একশো লেখা হয় ছোট্ট একটা ঞ-এর পিঠের পুঁটলির মতো। তার বেশি হিসাব নেই-ও, তার দরকার-ও নেই। ১০০ পয়সায় এক টাকা হয়। তার বেশি পয়সা কারো থাকে নাকি?

বড়গাঁওয়ের হাটে সবাই বদলা দিয়ে জিনিস কেনে। আনারস দিয়ে আলু; মুরগির ডিম দিয়ে রান্নার তেল; গতর খেটে খেটোর দাম শোধে। খেটো হল গিয়ে তাঁতে বোনা মোটা ধুতি শাড়ি। হাঁটুর নিচে নামে না। বলি, নামার দরকারটাই বা কোথায়? মাটিতে কাপড় লুটোলে, তাই পরে পাহাড় চড়া যায়? এই ভাবেই এরা চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছে। এ বড় ভাল নিয়ম। বুড়ো ঠাকুমারা বলে—'কত লড়াই বাধল থামল, কত রাজ্য উঠল পড়ল, ধুলোর মতো উড়ে গেল, কই আমাদের তো কিছু হল না!'

সূর্যের ওঠা-ডোবা দিয়ে দিনের হিসাব। ঘড়িটড়ি নেই, সূর্য ঘড়িও নয়। চাঁদ দিয়ে মাসের হিসেব, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক পূর্ণিমা। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা আধা মাস, এক পখ। পূর্ণিমাতে

অমাবস্যাতে উৎসব করতে হয়। মংলু মুংরিদের তখন ফূর্তি দেখে কে।

সারাদিন ছেলেমেয়েগুলো বনে বনে ঘোরে। উনুন ধরাবার শুকনো কাঠ কুড়োয়; ঝাউগাছের শুকনোগুটি কুড়োয়, তাতে তেল টুপটুপ করে, দাউদাউ জ্বলে আর ঘরময় সুগন্ধ ছড়ায়। সরলগাছের গা থেকে ওরা ধূপকাঠ ছুলে আনে; বড়গাঁর হাটে বেচে সংসারের জিনিস কেনে। বনে কোথায় মৌচাক হয়েছে, সেই খবর আনে; গাছের গায়ে কোথায় আঠা জমেছে দেখে আসে। গাই গরু ছাগল চরাতে আরো উঁচুতে ঘাসজমিতে যায়।

সেখানে লম্বা লম্বা মিষ্টি ঘাস, কোনোটাতে বা লেবু পাতার মতো সুবাস। সেগুলো শুকিয়ে পোড়ালে মশা পালায়। তার চাহিদাও কম নয়। বনগাঁয়ের ছেলেমেয়েরা কম কাজের নয়। তবে আলো থাকতে থাকতে ওরা ঘরে ফিরে আসে, ওসব জায়গায় বেঁটেদের ভয়। বেঁটেরা বড় সাংঘাতিক হয়। তাদের কেউ চোখে দেখেনি, খালি চোদ্দ পুরুষ ধরে গল্প শুনে এসেছে।

পাহাড়ের ওপার থেকে আসে তারা। ভালুকটালুক নয়। তার চেয়েও অনেক ভয়ংকর। মুখে বিষ তীর লাগিয়ে পোয়াটাক পথ দূরে দাঁড়ানো মানুষকে ঘায়েল করে। চোখের দিকে চাইতে হয় না; চাইলে অমনি জাদু করে দেয়। তখন কি হতে কি হয়ে যায় তার ঠিক নেই। ছেলেমেয়েগুলো গেল হয়তো ১০ জন, নিয়ে গেল ১৫টা গরু ছাগল। ঘরে ফিরে গুণে দেখা গেল ১০ জন ছেলেপুলেই এসেছে, কিন্তু জানোয়ার এসেছে ১৭-১৮টা। তা কে সত্যি আর কে জাদু, তাই বা কে বলবে।

অবিশ্যি এদের জীবনকালে এমন ঘটনার কথা শোনেনি কেউ। তবু বুড়ি ঠাকুমারা বলে, 'হয়নি তো হতে কতক্ষণ। ক-ন থেকে ক-ন হয়ে যাবে, কে বলতে পারে। দিনের আলোয় বেঁটেরা চোখে দেখে না, তাই রাত নামার আগেই ফিরে আসিস্।'

তাই আসেও ওরা। খালি থেকে থেকে ওদের দলের পাণ্ডা, নাটের গুরু সোনদেও বলে একবারটি বনে রাত কাটিয়ে দেখতে হবে ওরা কেমন ধারা চিজ্। সবার বড় ঠাকুমা যে সোনকে কোলেপিঠে



মৌ-গাছের তলায় বেঁটেদের একটা ছোট্ট ছানা পড়ে পড়ে কাঁদছে

করে এত বড়টা করে তুলেছে, সে বলে 'ও-কথা বলিস্‌নে বাপ! তোর কোনো অনিষ্ট করবে-না ওরা। খালি আমার কোল খালি করে তোকে ধরে নিয়ে যাবে!'

সোনদেওয়ের না আছে মা, না আছে বাপ। তা থাকতেও পারে দূরে কোথাও, কিন্তু কেউ জানে না। দশ বছর আগে বনদেওয়ের পরবের জন্য বনে যারা ভোরবেলায় মধু আনতে গেছিল, তারা দেখল মৌগাছের তলায় বেঁটেদের একটা ছোট্ট ছানা পড়ে পড়ে কাঁদছে। ভয়ে কেউ কাছে যায় নি, যদি কেউ জাদু করে দেয়! মৌতলায় ভালুকের মতো পায়ের ছাপ। বিকেলে বাড়ি ফেরার সময়েও দেখে তখনো ছানাটা সমানে কাঁদছে। গলা শুকিয়ে গেছে, স্বর বেরুচ্ছে না। গাঁয়ে ফিরে সে কথা বলতেই, সবার বড় ঠাকুমা ধ্বস নেমে যার নাতি চাপা পড়েছিল, কাউকে কিছু না বলে একা একা বনে গিয়ে ছানাটাকে তুলে এনেছিল। তখন তার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না।

গরম জলে তার গা মুছিয়ে, পলতে করে ফোঁটা ফোঁটা দুধ খাইয়ে, বুড়ি তার প্রাণ বাঁচাল। সেই ইস্তক সে বড় ঠাকুমার কাছেই থেকে গেল। নাম হল তার সোনদেও। সোন মানে হল গিয়ে সুন্দর আর দেও হল দেবতা। মানুষের ছেলে তো আর এত সুন্দর হয় না। বেঁটেদের নাম কেউ মুখেও আনল না। মনের সন্দেহ মনেই চেপে রাখল। তাছাড়া বেঁটে নয় মোটেই। লক্‌লক্‌ করে সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। গায়ের রঙে যেন সোনা ফেটে পড়ছে, পাটকিলে চোখ, কোঁকড়া চুল। অমন চেহারা গাঁয়ের কারো নেই।

হলে হবে কি, মহা দুরন্ত। যেমনি চালাক, তেমনি অবুঝ। এই ঝরণার ওপর থেকে ঝাঁপ দিল, পাহাড়চূড়োয় বাজপাখির বাসা থেকে দুটো বড় বড় ডিম নিয়ে এল। এনে মা-মুরগির বাসায় রেখে বাচ্চাও ফোটাল। সুখের বিষয় মুরগি ঘরের অশেষ ক্ষতি করে বাজপাখির ছানা দুটো উড়েও গেল একদিন। তাদের উড়ে যাওয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে বুড়ো-দাদু বড় ঠাকুমাকে বলেছিল, 'এর জন্য মনকে তৈরি করে রেখো।' আর কিছু বলতে হয়নি। বড় ঠাকুমার মুখে সারা দিন হাসি নেই।

সেবার বনদেওয়ের পরবের দিন, দেওতার থানের সিঁড়ির পাশে সোনকে বসিয়ে, বড় ঠাকুমা তাকেও ভোগের ভাগ দিল। সোন সব চেটে পুটে খেয়ে ফেলল। এক কণা প্রসাদ রাখল না। মংলুরা তাই নিয়ে রাগারাগি করলে সোন হেসে বলেছিল, 'বড়িয়া দেও তো সবই রেখেছে তোদের জন্য।' বলা বাহুল্য এতেও ছেলের মতিগতি ফেরেনি।

'ছেলের কত গুণ দেখেছিস্?' বলত ঠাকুমা, 'গুণীরা অমন একটু দুরন্ত হয়েই থাকে। কেমন বাঁশিতে বাতাসের সুর বাজায় শুনিস্। পাখি ওড়া দেখে বৃষ্টির গতি বলে দেয়।' গাঁয়ের বুড়োদের পায়ের কাছে বসে সব কথা শুনে রাখত সোন আর একবার যা শুনত, জন্মে ভুলত না।

বুড়ো-দাদু বড় লড়াইতে পল্টনের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে ডান হাতটা খুইয়ে এসেছিল। তাই মাসে মাসে মোটা পেন্‌সিল পেত। অবিশ্যি দেখেনি পেন্‌সিলগুলো সোন; তবে একটা সুন্দর বন্দুকও পেয়েছিল, সেটি অনেকবার দেখেছিল। বুড়োদাদু সেটি হপ্তায় হপ্তায় সাফ করার সময় ওকে দেখিয়ে দিয়েছিল কেমন করে বন্দুক ছোঁড়ে। দুঃখের বিষয় গুলি ছিল না। এক কালে বড় বড় ভালুকের উপদ্রব ছিল। তাদের মেরে দাদু গুলি সব শেষ করেছিল।

হাত খুইয়ে বুড়োদাদু নাকি পল্টনের রসদের হিসেব রাখত। লিখতে পড়তে হিসেব কষতে শিখেছিল। এখনো গাঁয়ের সবাই বুড়োকে দিয়ে চিঠিপত্র পড়িয়ে নিত। জবাব লেখাত। জমিজমার হাত বদলের সময় মোড়ল এসে ওকে দিয়ে দলিল তৈরি করাত। মোড়ল লিখতে পড়তে জানত না, কিন্তু বাতাস শুঁকে ঝড়ের গন্ধ পেত, আকাশে ওড়া কালো বিন্দুর মতো দেখতে বাজপাখিকে তীর মেরে নামাত। নইলে মুরগির পালের দফা রফা হত। সোন বুড়ো-দাদুর পাকা চুল বেছে দিত আর এই সব বিদ্যে শিখে নিত। বুড়োদাদু টেরও পেত না। নইলে প্রাণ হাতে করে রপ্ত করা বিদ্যে কি এতই

খেলো যে যে এসে হাত পাতবে, তাকেই দিয়ে দিতে হবে ? ভিক্ষে করে পাওয়া যায় না এসব, কষ্ট করে লড়াইয়ে গিয়ে লড়ে আনতে হয়।

গাঁয়ের ছেলেরা বলত, 'লড়াই কোথায়, দাদু, যে লড়ে আনব ?' বুড়ো ওদের চোখের দিকে চেয়ে বলত, 'সে কি আমার দোষ ? আমার বন্দুক তো তেল দিয়ে তৈরি রাখি। তাছাড়া লড়াইয়ের দুঃখও কিছু কম নয়। কি সব দেখেছিলাম বর্মায়, বললে তোদের পেটে ভাত রুচবে না। এখন পালা দেখি।'

কিন্তু সোন বুদ্ধি করে কিছু শিখতে বাকি রাখেনি। একটা বই ছিল বুড়োদাদুর। একটাই বই। বাংলায় লেখা। পল্টনের ডাক্তার, যিনি ওর হাতের গুলি বের করে দিয়েছিলেন, মরার সময় তিনি সেটি ওকে দিয়ে গেছিলেন। যীশু বলে একটা ছেলের ছোট বেলাকার গল্প। ছুতোরের ছেলে। ওর বাবা কাঠের কাজ করত। যেমন বনগাঁয়ের অনেকে এখনো করে। বুড়োদাদুও আগে চমৎকার কাঠের কাজ করত। তক্তার ওপর নক্সা ফোটাত। তারপর ডান হাতটি গেলে, নক্সা বন্ধ হল, শিকার শিকেয় উঠল, বুড়োদাদু পাখি মারা ছেড়ে পাখি দেখা ধরল।

এক কালে কাঠ কেটে দরজা জানলা, খেলনার পুতুল, ঘোড়া বানাত, এখন একটু বৃষ্টি পড়লেই বন যেখানে পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে একটা গাছ গেছে তো দুটো গাছ লাগিয়ে আসে। বনগাঁওয়ের বড় বন দেখবার মতো।

যীশুর বই পড়ে সোনের বড় কৌতূহল হয়। বুড়োদাদুকে বলে, 'বিদেশ গিয়ে দেখে এলে নাকি ঐ ছেলেটাকে ?' বুড়োদাদু শুনে অবাক্, 'ওমা, সেদেশে গেলাম কখন যে দেখব। তবে তার মন্দির দেখেছি। ওপরটা সরু চূড়োপানা, তার আগায় দুটো রূপোলী কাঠ আড়াআড়ি লাগানো। সায়েবরা সেখানে পূজো দেয়। কি সুন্দর ভেতরটা। সবাইকে ঢুকতে দেয়। খোকা কোলে আমাদেরই বনদেবীর

মূর্তি দেখলাম। ছাদে কত ছবি আঁকা, বড় বড় আলো ঝুলিয়েছে, সোনারূপোর পর্দা টাঙিয়েছে, আর কত ফুল, কত ফুল, চারদিক মো-মো করছে। আমাদের বনদেওয়ের থানে না আছে দেয়াল, না আছে ছাদ, না আছে পরদা গালচে, না আছে কিছু! কি সুন্দর বাজনা বাজে মন্দিরে।' বুড়ি ঠাকুমা চটে গেল। 'নেই আবার কি রকম কথা? ঐ তো মাথায় গোলপানা নীল আকাশের ছাদ, তাতে রাতে কত তারা জ্বলে। চারদিকে ঐ তো রোদ বিষ্টিতে বেড়ে ওঠা সবুজ গাছের দেয়াল। বনে কত ফুল ফোটে, কত পাখি গান গায়। হুঁঃ তোমার যেমন কথা। আমাদের বনদেওয়ের থানের মতো জায়গা কোথায় আছে? তবে হ্যাঁ, ওটাও হয়তো বনদেবীর-ই মন্দির।'

সোন বলে, 'কিন্তু দাদু বিদেশ গিয়েও যীশুকে দেখে এল না, এটা কি করে হল?' 'আরে বিদেশ কি একটা জায়গা, নানা রকম লোক, তারা নানা ভাষায় কথা বলে, নানা অক্ষরে চিঠি লেখে—'

শুনে এমনি অবাক হল সোন যে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল,—'তবে কি, এই যে এতদিন ধরে শিখলাম অ-আ-ক-খ এই নিয়ে সব বই পড়া যাবে না?'

বুড়োদাদু নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তার চেয়েও বড় কথা বনের নতুন চারাগুলো সব মরে গেছে।'

॥

সবাই আঁৎকে উঠেছিল। বর্ষায় লাগানো নতুন চারা মরে যাবে কেন? মোড়ল-ও পরে এসেছিল। তার বড় ভাবনা, 'বর্ষাও তো এ বছর ভালো হল না, বুড়োবাবা। গ্রীষ্মকালে নদীতে ঢল নামল। সারা হেমন্ত, শীত, বসন্ত ধরে শুকনো হওয়ায় মাটি ঝুরঝুর করে খসে গেল। তলাকার পাথর বেরিয়ে পড়ল।' সোন বলে বসল, 'ঐ পাথরে কি চিকচিক করে, দাদু?' 'কি জানি বাবা, চোখে ভালো দেখি না। নীল আকাশে কালো তিলের মতো চিলের বেশি কিছু নজর নেয় না। কাছের জিনিস মোটে ঠাওর হয় না, বাপ। চিকচিক করে বুঝি?'

সোনের ভারি উৎসাহ, 'সোনা নয় তো, দাদু? তাহলে বেশ হয়। মাটির সঙ্গে গাছপালারা ধ্বসে গেলে, আমরা সোনা বেচে বড়লোক হয়ে যাব, না দাদু? তোমার ঐ ছুতোরের বইতে ছবি আছে, মাথায় মুকুট পরে হাতে ওষুধ নিয়ে বড়লোকরা খোকা দেখতে এসেছে। তাহলে আমরা ওষুধপত্র গরম কম্বল কিনতে পারব, না দাদু?'

মোড়ল কাষ্ঠ হেসে বলল, 'মাটি ধ্বসল, গাছ খসে গেল, হাতিরাও নীল পাহাড় ছেড়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু গরমকালে গরম হল না, বর্ষাকালে জল হল না, গত বছর শীতকালেও শীতের হাওয়া দেয়নি। এর ফল ভালো হবে না, বুড়োবাবা, এই আমি বলে রাখলাম। তুমি দেখে নিও। উত্তর দেশ থেকে পাখিরা এখনো দখিন দিকে উড়ে যাচ্ছে না কেন?'

বুড়োদাদু মাথা নাড়ল। 'আমি তো একটাই উপায় দেখি। ছেলেপুলেগুলোকে গুহাঘরে বাবাঠাকুরের কাছে পাঠানো যাক। যা দিশে দেবার, তিনিই দেবেন।'

বড়ঠাকুমা তো অবাক! 'ওমা সে কি কথা। বাবাঠাকুর তো কথা কন না আজ চল্লিশ বছর। কেউ তাঁকে চোখেও দেখেনি। দিশে দেবেন আবার কি! অনেকে বলে তিনি মেঘে চেপে সগ্‌গে গেছেন।'

মোড়ল বলল, 'তিনি কথা না বললেও, তাঁর হয়ে দিদি ঠাকরুণ বুদ্ধি দেবেন। তবে জানই তো ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া কারো সঙ্গে তিনি দেখা করেন না।' এ-কথা শুনে সবাই চুপ। সোন বুড়োদাদুর পেছনে বসেছিল। এবার সামনে এসে বসল। মোড়ল বলল, 'একজন সাহসী আর জোরালো ছেলে চাই। সে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। যে যেতে চায় না, এমন ছেলেমেয়ে গেলে চলবে না। জনা দশ-বারো তো চাই। পথে নানা ভয়। আছে তোমাদের বনগাঁয়ে সে রকম ছেলেমেয়ে?'

সোনদেও উঠে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বলল, 'আছে।' শুনে মোড়ল চুপ। বুড়োদাদু বলল, 'আর কে কে যাবে?' সোনদেও একবার চারদিক চেয়ে বলল, 'মংলু, মুংরি, বুধন, বুধো, মাধো, চম্পা, টেমি, গুঁপো, ল্যাংড়া, এরা সবাই যাবে।' একে দুইয়ে তারাও উঠে সোনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সবাই যাব।'

বড়ঠামুর কি ভাবনা। 'ওরে ও পথ যে বেঁটেদের বনের মধ্যে দিয়ে গেছে। কি করে ছাড়ি তোদের? ও বাবা-মারা, তোরা ছাড়বি ওদের?' কারো মুখে কথা নেই।

সোনদেও বড়ঠামুকে আদর করে বলল, 'সাবধানে যাব মা, দিনের বেলা হাঁটব, রাতে গাছে চড়ে থাকব। ওরা দিনে চোখে দেখে না আর কোন সময়ই গাছে উঠতে পারে না। তাছাড়া ওরা নেইও।'

নেই! বলে কি ছেলে? কারা তবে শস্যে পোকা লাগায়, গরুদের রোগ ধরায়? বন-দেও তো খালি উপকার করেন। বুড়োদাদু উঠে দাঁড়াল, 'ভেবো না, জংলির মা, আমি বনের কিনারা অবধি সঙ্গে যাব।

ওরা না ফেরা অবধি ঐখানে থাকব। আমার মিলিংটারি তাঁবুটে নিয়ে যাব।'

যাক, তবে আর ভয় নেই। বুড়োদাদু কাছে থাকলে কোনো বিপদ ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। লড়াইয়ের সময় কে বাঁচিয়েছিল গ্রামবাসীদের? বর্মা গিয়ে লড়ে এসেছিল না। হাতটা রেখে এল।

মোড়ল বলল, 'তাহলে কাল সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া। রসদ বইবার জন্য আমার খচ্চরটা দেব।' বুড়োদাদু মাথা নাড়ল, 'না, না, যে যার নিজের রসদ নিজে বইবে। খচ্চর নিলেই জানান দেবে। পায়ের মতো আছে কি?'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। রাতে তাই নিয়ে নাচগান হল। মা-বাবারা থলিতে চিড়ে, মুড়ি, মোয়া, ক্ষীরের পাত, চীনেবাদাম ভাজা, এই সব ভরে দিল। হাল্‌কা শুকনো জিনিস, মাস গেলেও নাশ হয় না। খুদে একটি করে এলুমিনিয়ামের লোটা দিল। ঝরণার জল বড় মিষ্টি। বুনো শূওরের মাংস রান্না হল। অনেক রাতে খেয়ে দেয়ে সব শুতে গেল। আবার ভোরে ওঠা। সে ওদের অভ্যেস ছিল।

পরদিন চুপিসাড়ে যে-যার বেরিয়ে পড়ল; কাউকে ডাকা নেই বলা নেই। বলে গেলে কান্নাকাটি করে যদি কেউ। ঝরণাতলায় সবাই এক হল। তখনো পূবে সূর্য ওঠেনি। কিন্তু পশ্চিমের আকাশে আগের থেকেই একটু গোলাপি রং লেগেছে। গাছে গাছে বুনো পেয়ারা পেকে ঝুলছে। তাদের ভেতরটা ফিকে গোলাপি। পশ্চিম আকাশেরই মতো। কি মিষ্টি, কি মিষ্টি! আর কি ভালো গন্ধ। পেট ভরে পেয়ারা খেয়ে, লোটা ভরে ঝরণার পরিষ্কার জল খেয়ে, ওরা পাহাড় চড়তে আরম্ভ করল। তবে পেয়ারাগুলো অন্য বছরের চেয়ে ছোট। পাখির ডাক-ও কম।

সবার আগে সোনদেও। সে বলল, 'চড়াইয়ের সময় কথা নয়। মুখ বুজে, পায়ের তালে তালে শরীর দুলিয়ে নিশ্বাস নিয়ে হাঁট্‌ দিকিনি।'

গুঁপো বলল, 'কেন?' সোনদেও হাসল, 'তাহলে দম ফুরোবে না। রাত নামার আগেই গুহা-ঘরে পৌঁছে যাব হয়তো।'

মাথার অনেক ওপরে ঐ দেখা যায় নীল নীল চূড়ো। তারি মধ্যিখানে গুহাঘর। বিপদ না হলে এ পথে কেউ যায় না। সেই বড় লড়াইয়ের আগে বুড়োদাতুরা চার-পাঁচজন গেছিল। বুড়োঠাকুর নাকি দূর থেকে তাদের দেখেই রাগে গরগর করতে করতে নেমে এসেছিলেন। খেঁকিয়ে বলেছিলেন, 'শত্তুর এসে গাঁ জ্বালাবে, তাতে আমার কি রে, ব্যাটারা? আমি সেখানে থাকি, না গরু-ছাগল রাখি? তোদের গাঁ তোরা বাঁচাবি। এতটুকু মুরোদ নেই তোদের? যা, ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আয়।'

বুড়োদাতুর সব চেয়ে সাহস। সে বলেছিল 'তাই বলছ, ঠাকুর? লড়ব গিয়ে? একটু জলখাবারও দেবে না?' বুড়োঠাকুর হো হো করে হেসেছিলেন। 'কোত্থেকে দেব শুনি? আমার কি নোটেল আছে? যে আমাকে দেয়, সে-ই তোদেরো জলখাবার দেবে। এবার রওনা দে!' বলে পিছন ফিরে হন্‌হন্‌ করে ঐ শেষের খাড়া জায়গাটুকু পার হয়ে কুয়াশার পেছনে আড়াল হয়ে গেলেন। এ-সব বুড়োদাতুর কাছেই শোনা। কিছু কিছু হয়তো ভুলে গেছে, ঠিক বলেনি। তবে ওখানে গেছিল সেটা ঠিক।

অনেকটা উঠে গিয়ে সোনদেও থমকে দাঁড়াল। ও কি ঠিক দেখছে, নাকি চোখের ভুল? পাহাড়ে উঠলে অনেকে যা নেই তাই চোখে দেখে, কানে নিঃশব্দের আওয়াজ শোনে—এ-ও কি তাই? কিন্তু সে তো অনেক ওপরে। এখনো যে বেঁটেদের বন শুরুই হয়নি। ঐ তার নীল রেখা দেখা যায়। নীল মানেই দূর। আগে নীল, তারপর ছাই রং, তারপর মিলিয়ে যায়।

সোনের মনে হল বোঁচ্‌কা-বুচ্‌কি নামিয়ে বুড়োদাতু বসে আছে। তাঁর পাশে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে, উনুন জ্বেলে বড়ঠামু রান্না চাপিয়েছে। মোড়ল তার খচ্চরের গায়ে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে আছে!

ওদের দেখেও বড়ঠামু হাতা দিয়ে হাঁড়ি ঘুঁটতে লাগল। কিন্তু মোড়ল দু-হাত তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে নেমে এল। 'তোদের আর বেশি গিয়ে কাজ নেই। বুড়োদাদুর বড় সাংঘাতিক সব কথা মনে পড়েছে। এইখানে চড়িভাতি করে সবাই একসাথে নেমে যাব।'

কর্কশ গলায় সোন বলল, 'নামবেই যদি তা হলে উঠেছিলে কেন তোমরা?' বুড়োদাদু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'বাঃ, তখন যে মনে ছিল না। সে বড় ভয়ের ব্যাপার। তোদের ঐ বনে কোনমতেই যাওয়া হবে না।' বড়ঠামু বলল, 'ঐ কালো থলিতে ছাখ্, গুড়ের কদ্‌মা আছে।' আর বলতে হল না। দুটো করে বড় বড় কদ্‌মা কোলে নিয়ে ওরাও ঘাসের ওপর বসে পড়ল। তখন চারদিক মিষ্টি রোদে ভরে গেছিল।

কদমা চুষতে চুষতে সোন বলল, 'কি ভয়ের ব্যাপার? তুমিই না বলেছ ভয়টয় বলে আসলে কিচ্ছু নেই। ও-সব লোক মনে মনে গড়ে।'

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বুড়োদাদু বলল, 'সে অন্য বিষয়ে বলেছিলাম। এটা বেঁটেদের ব্যাপার। সবাই বলে কেউ বেঁটে দেখেনি। কিন্তু আমি দেখেছিলাম। কি বিকট তারা। মাথায় এই এতটুকু দেখতে, নাকমুখ লেপাপোঁছা, বোল্‌তার মতো ভয়ংকর চোখ, শুঁড় আছে, নল দিয়ে চারদিকে আগুন ছিটোচ্ছে আর গাছপালা ঘাস লতাপাতা খরগোশ হরিণ সাপ কাঠবেড়ালি সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!'

সোন কাছে এসে বলল, 'কখন দেখলে এত সব?' বুড়োদাদুর চোখে জল এল, 'হ্যাঁরে বাপ, তুই কি আমার কথা বিশ্বাস করছিস না? ও-বনে গিয়ে কাজ নেই। বুড়োঠাকুর চলে গেলে তারপর দেখেছিলাম। বনের গাছে একটা নোটিস্ লট্‌কানো ছিল।' 'কি ছিল তাতে লেখা?'

বুড়োদাদু মাথা নাড়ল, 'কি জানি, বাবা। তখনো লিখতে পড়তে জানি না। বর্মায় গিয়ে হাত খোয়াবার পর, হাস্পাতালের পাদ্রী

সায়েবরা এ বি সি ডি শেখাল। সরকারবাবু ক খ গ ঘ শেখাল।' বুক ফুলিয়ে বুড়োদাত্থ বলল, 'আমার সব লেখাপড়া শেখা হয়ে গেছে। রোজকে রোজ মাথা পিছু এক সের চালের হিসাব রাখতে হত, তা জানিস্? এখন আমার কথা শোন, ঘরে ফিরে চল্।'

সোন-ও মাথা নাড়ল, 'নাঃ সেই বুড়োঠাকুর কি বলে শুনেই যাই। ওঠ্ তোরা।' চ্যালাচামুণ্ডারা এক কথাতেই তৈরি। তারপর কি কি মনে হতেই বলল, 'সে-ও পুড়ে মরেনি ঠিক জান?'

বুড়োঠামু বেজায় চটে গেল, 'তোর দেখছি বড্ড বাড় বেড়েছে, হতভাগা। আগুন তাঁর কি করতে পারবে? তাছাড়া তিনি নদীর ধারা বেয়ে উঠে গেছলেন। বেঁটেদের বনে যানই-নি।'

ছেলেমেয়েগুলো তাই শুনে বলল, 'আমরাও তাই যাব। ঝরণার ধাপে ধাপে পা রেখে উঠে যাব। কতটুকু জল এখন ঝরণায়! যাব না তো কি? চারাগাছের শেকড় লাগছে না, গরমের সময় জল হচ্ছে, বর্ষাকাল খরখরে, শীতের সময় শীত নামছে না, বুনো হাঁসের ঝাঁক আসছে না। আমাদের যেতেই হবে।'

সোন বলল, 'না গিয়ে উপায় নেই।' বুড়োঠামু বলল, 'তাহলে খিচুড়ি খেয়েই রওনা দে।' তাই হল শেষ পর্যন্ত। খাওয়াদাওয়ার পর মোড়ল খচ্চর নিয়ে নেমে গেল। তাঁবু আনবে, কম্বল আনবে, বুড়োদাত্থর গুলিহারা বন্দুক আনবে। এরা দুজন রইল, ছেলেমেয়ের দল ফেরা তক।

খানিক জলে জলে হেঁটেই বোঝা গেল রাতের আগে গুহাঘরে পৌঁছন যাবে না। গাছের ওপর রাত কাটাতে হলে বনের মধ্যে যেতেই হবে। ঝরণার ধাপে ধাপে ওঠা চাট্টিখানিক কথা নয়। পাথর নড়ে যায়; পা হড়কে যায়; জল বড় ঠাণ্ডা; আঙুল হেজে যায়।

ছেলেমেয়েগুলো ঝরণার ধারের গাছের ডাল ধরে ঝুলে ডাঙায় উঠে পড়ল। 'ও সোন, যারা নেই তাদের অত ভয় করা কেন?' 'ভয়

না। কিন্তু কথা দিয়ে এলাম যে।' তখন আরো খানিকটা ঝরণা বেয়ে উঠল ওরা। তারপর ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমেছে জল। দুপাশে খাড়া পাথর। ওরা বনের পথ ধরল।



গাছের ডাল ধরে ঝুলে ডাঙায় উঠে পড়ল

বনের গাছের মাথার দিকে ঘন পাতা, নিচের দিকটা ন্যাড়া, ঝাড়াঝাপ্টা। ছোট ছোট ফুলের ঝোপ। কি সব সড়সড় করে হেঁটে বেড়ায়। বড় বড় গিরগিটির মতো জানোয়ার উঁকি মারে। তাদের জিব সাপের জিবের মতো চেরা। কেমন গা শিরশির করে। ওরা কম কথা বলে।

এক সময় ছাই রঙের ছোট ছোট লোমশ বাঁদরের মতো দেখতে জানোয়াররা গাছ থেকে নেমে ওদের সঙ্গ নিল। এখানে শীতের জন্য

সবার গায়ে লোম। তবে গ্রীষ্মকালে অনেকের লোম পাৎলা হয়ে যায়। এই সময় আবার গজায়। বাঁদরকে মনে হয় ভাল্লুক। বড় বড় লোমশ কাঠবেড়ালি ঘাসের বিচি, ঝাউ গাছের গুটি সংগ্রহ করে রাখছে। এখানে শীতকালে শিশির জমে যায়। ছোট জানোয়াররা যে যার গর্তে ঢুকে নিরাপদে ঘুমোয়। পাখিদের দেখা যায় না। খালি মাথার অনেক ওপরে বড় বড় চিল ওড়ে। তাদের চোখ থাকে মাটিতে। শীতে পাখিদের বড় কষ্ট।

ঝাউবন শেষ হয়ে গেলেই খানিকটা ঘাসজমি। সেখানে বাঁদররা ওদের সঙ্গ ছেড়ে আবার বনে গিয়ে ঢুকল। ওরা একটু বসল। ঝরণার জল খেল, মুড়ি নাড়ু খেল। এই পর্যন্ত সোনের মতো বেপরোয়া ছেলেরা আরো এসেছে। গাছের তলা থেকে পালকের মতো দেখতে ছত্রাক তুলে নিয়ে গেছে। সে খেতে বড় মিষ্টি। নিচের হাটে অনেক দামে বিক্রি হয়। আজো তোলা যেত, কিন্তু কে রাঁধে কে খায় তার ঠিক কি। মংরু বলল, 'আমার ছোট থলিতে ভরে বুড়োঠাকুরের জন্য কিছু নিয়ে যাই। কেমন?'

সবাই মিলে তুলতে খুব সময় লাগল না।

III

কিন্তু বিকেল কি আর কারো জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে ? দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়ল, সোনালি রোদ লালচে হল। নিচের সমতল ছায়ায় ঢেকে গেল, পাহাড়ের তখনো মিষ্টি রোদ। সোনদেও বলল, 'ডাল মেলে দেওয়া বড় গাছ টাছ ছ্যাখ্। সেখানে রাত কাটাতে হবে।' ঝুংরি বলল, 'ভালুকরাও তো গাছে উঠতে পারে।' সোন বলল, 'উঠুক।' বুধন বলল, 'আমার চাচির বাবা তরাইয়ের বনে গাছের ওপর থেকে অজগর ঝুলতে দেখেছিল।' সোন বলল, 'এত ওপরে অজগর থাকে না। বন কতটা পাতলা দেখিস্ না, বড় গাছ খুঁজতে হবে। কোনো ভয় নেই রে তোদের। এখানে কোনো জানোয়ার কি মানুষের সাড়াশব্দ নেই—'

বলতে বলতেই কানে এল অনেক দূরে ডিমি-ডিমি মাদল বাজছে। মনে হল মাদলের শব্দ ক্রমে কাছে আসছে। কাউকে কিছু বলতে হল না। সবাই সামনের ঝাউগাছে সড়সড় করে উঠে পড়ল। ওপরে উঠেও চম্পা বলছিল, 'মোড়লের মা নিচের গাঁয়ে বেলগাছের ডাল থেকে ঠ্যাং উঁচুতে, মুণ্ডু নিচুতে করে, চুল ঝুলিয়ে, লটকে থাকতে দেখেছে।' কেউ মুখে আনল না যে বেঁটেরা রাতে বেরোয়।

সোন বলল, 'কাকে দেখেছে?' চম্পার ভাই ল্যাংড়া বলল, 'শাঁকচিন্নি বলে তাদের।' সোন বলল, 'তবে শুনে রাখ্। শাঁকচিন্নি ঝোলে ভীতু লোকের মনের ভেতরে। গাছের ডালে কুঁড়ি ধরে, ফুল ফোটে। মা বলে যে জায়গার চারদিকে গাছ ঘিরে থাকে, সে জায়গাই মন্দির হয়ে যায়। পয়সা খরচ করে মন্দির তৈরি করার দরকার হয় না।'

ভয় পেয়ে ওদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। বুধন বলল, 'ও তোর মা নয়। মা কখনো অত বুড়ো হয়? তোকে বেঁটেদের বন থেকে ও মাঝরাতে গিয়ে কুড়িয়ে এনেছিল। তুই বেঁটেদের ছেলে।' কারো মুখে কথা নেই। ওরা জানে রাতে বেঁটেদের নাম-ও করতে হয় না। মিছিমিছি রাগের মাথায় কথাটা বলে ফেলল। একটু চুপ করে থেকে সোনদেও শুধু বলল, 'ও-ই আমার মা।' চম্পা চটে গেল, 'না, সোন বেঁটে নয়। ও সব চেয়ে লম্বা। বেঁটেরা দিনে দেখতে পায়? গাছে চড়তে পারে?' রেগে বুধন ওকে একটা ঠেলা দিল। পড়েই যেত চম্পা যদি ল্যাংড়া ওকে ধরে না ফেলত। ল্যাংড়া বুধনের মাথায় একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিল। বুধন ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, 'রাতে আমি লাল চালের ভাত দিয়ে ছাগলের দুধ দিয়ে কলা দিয়ে খাই!' তাই শুনে সব কটা ছেলেমেয়ে এমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ লাগাল যে বলার নয়।



দলে দলে লোক মাথায় বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে তারি মধ্যে প্রায় গাছতলায় ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি করে মাদল বেজে উঠল। পাতার ফাঁক দিয়ে নিচে তারার আলো পড়েছে। সেই

আলোতে ওরা দেখল দলে দলে লোক মাথায় বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। ওপরের ঘাসজমিতে যারা ছাগল চরাত, যারা কাঠ-চেরাই করত, যারা ফালতু কাঠ পুড়িয়ে কাঠকয়লা বানাত, সবাই নেমে আসছে। কারো কাঁধে লোটা কম্বল, কারো মাথায় জ্বালানি কাঠ, কারো হাতে হাতিয়ার। আগে আগে বাজনদাররা চলেছে। গাঁ খালি করে পাহাড় থেকে সব নেমে আসছে। সবাই দেখে ভয়ে কাঠ।

খালি সোনদেও কখন নেমে পড়েছিল। সে বাজনদারদের জিগ্‌গেস করল, 'ঘর ছেড়ে, পাহাড় খালি করে কোথায় চললে তোমরা?' তাই শুনে দশজন বলে উঠল, 'না গিয়ে করি কি? বড় ঝরণায় বিকেল থেকে জল নেই! শেষে কি তেষ্টায় সব ছাগল ভেড়া নিয়ে মরে থাকব? তুমিই বা যাচ্ছ কোথায়?'

সোনদেও বলল, 'যাচ্ছি বুড়োঠাকুরের থানে। আমাদের গাঁয়ের বুড়োবাবা বলেছে তাঁর কাছে সব কথার জবাব আছে।'

ওরা হো-হো করে হেসে উঠল। 'জবাব আছে তো সব জল শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? গাছে নতুন পাতা নেই কেন? এক দিন একটু হাওয়া দেবে তো গাছে গাছে ঘষা লেগে আগুন ধরে যাবে, জ্বলে পুড়ে সব খাক্ হবে। বুড়োঠাকুর নিশ্চয় সগ্‌গে গেছে। আমাদের দেখবার কেউ নেই।'

সোনদেও অন্যদের ডাক দিয়ে বলল, 'ওরে তোরা নেমে আয়। এটা গাছে ঘুমোবার সময় নয়।' ততক্ষণে দলে দলে পাহাড়ি গাঁয়ের লোকরা সেখানে জড়ো হয়েছে। যে যার ক্ষেতের যেটুকু পেরেছে শুকনো ফসল তুলে এনেছে। তারা বলল, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা ছেলেমানুষরা? ওপরের গাঁয়ে একটা মানুষ বা একটা ছাগল নেই; কারো ক্ষেতে এক দানা শস্য নেই; নদীতে সরু এক জলের ধারা, তাও ক-দিন থাকে বলা যায় না। আমাদের পুরুত বলেছে এ হল সব্বনাশের আগ। এ সময় বাপের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হয়। তা তোমরা নিচু

পাহাড়ের মানুষরা ওপরে যাচ্চ কেন ? আমাদের সঙ্গে ফিরে চল। পুরুত বলেছে এর পর মাটিতে কাঁপুনি লাগবে। ফাটল দেখা দেবে। গরম জলের ফোয়ারা বেরোবে।'

খোকা কোলে মেয়েরা বলল, 'আমরা আর পারছি নে, সরকার। এইখানে বাকি রাতটা কাটিয়ে আলো হবার আগে পথ দেখব।' এই বলে যে যার কোলের ছেলে, মাথার বোঝা নামিয়ে বসে পড়ল।

এত লোক দেখে সাহস পেয়ে, গাছের ওপর থেকে মংলু মুংরি বুধন বুধো মাধো চম্পা টেমি গুঁপো ল্যাংড়া সবাই খচমচ করে নেমে এল। 'কোথায় যেতে হবে সোন ? পায়ে বড় ব্যথা।'

সোনদেও বলল, 'আজ রাতে এইখানেই বন্ধুদের সঙ্গে শোয়া। ভোরে ওরা নেমে যাবে। আমরা যাব ওপরে, বাবাঠাকুরের থানে।' তাই শুনে ভিড় থেকে ওদেরি বয়সী একটা ছেলে, একটা মেয়ে উঠে কাছে এল। ছেলেটা বলল, 'আমরাও তোমাদের সঙ্গে ফিরে যাব।' মেয়েটা ধরা গলায় বলল, 'মা-কে একা ফেলে এসেছি। মার পায়ে চোট লেগেছে, হাঁটতে পারছে না।'

সোন রেগে গেল, 'একা ফেলে আসতে লজ্জা করল না তোদের ? ছি ছি!' মেয়েটা কেঁদে ফেলল, ছেলেটা বলল, 'জ্যাঠা ধরে আনল মোদের।' 'কোথায় জ্যাঠা ?' 'সে ছাগল নিয়ে আগেই নেমে গেছে! তুমি আমাদের নিয়ে যাবে ?' 'বেশ চল্।'

সে রাতটা গাছতলায় ক্লান্ত মানুষগুলো হাত-পা এলিয়ে ঘুমিয়ে রইল। ভোর না হতেই যে যার উঠে পড়ে পথ ধরল। সেই ছেলে-মেয়েকে দিনের আলোয় সোনদেও চিনতে পারল না। তারাও কাছে এল না। হয়তো পরে দলের কাছ থেকে লুকিয়ে আসবে।

এই সময় গুড়গুড় শব্দ করে সমস্ত পাহাড় কেঁপে উঠল। আর কি সেখানে দাঁড়ায় গাঁয়ের লোকেরা। যে যার ছেলেমেয়ে তুলে নিয়ে, জিনিসপত্র অর্ধেক কুড়িয়ে, অর্ধেক ফেলে, দুদ্দাড় করে পাহাড় থেকে নেমে যেতে লাগল।

বনগাঁও থেকে আসা এরা দশজন হাঁ করে সব দেখল। এ পাহাড় তো অনেক সময়ই কাঁপে, তাহলে আজ এত ভয় কিসের? সোনদেও বলল, 'পাহাড় কাঁপার ভয় নয়রে, এ হল ভয়ের ভয়। যদি আরো ভয়ের কিছু ঘটে, তার ভয়। চল্, আমরা উঠতে থাকি। যে যার নিজের থলি নিয়ে এগোই, আয়। রোদ বেশি চড়লে, হাঁটতে কষ্ট হবে।'

তারপর ইদিক-উদিক তাকিয়ে রাতের সেই ছেলেমেয়ে ছুটোকে খুঁজতে লাগল। চম্পা বলল, 'কাল যারা এসেছিল, সেই ছুটোকে খুঁজছ নাকি? ঐ দেখ, তারা রওনা হয়ে গেছে।' সোন চেয়ে দেখল ছোট ছোট ছুটো ছেলেমেয়ে চিৎকার করে মা-মা বলে ডাকতে ডাকতে পাহাড় চড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে।

ওদের ধরে ফেলতে বেশি সময় লাগল না। দশ-এগারো বছর বয়স হবে। রুক্ষ চুল, বাঁকা চোখ, ফরসা রং, মিষ্টি মুখ। মেয়েটার নাম পেমি, ছেলেটার নাম পেমা। তারা যমজ ভাই বোন। মনে হয় অনেক দিন পেট ভরে খায়নি। পেমি বলল, 'কেউ পেট ভরে খায়নি আমাদের গাঁয়ে। আমাদের মাকে শুধু একটা শুকনো মকাই আর এক ঘড়া জল দিয়ে সবাই নেমে এসেছে।' এ-কথা বলবামাত্র ধড়মড় করে উঠে পড়ে পেমা মা-মা-মা বলে দৌড়তে চেষ্টা করল। হুমড়ি খেয়ে তেমনি পড়েও গেল।

টেমি ছিল সবার ছোট। সবচেয়ে কম খেত; গায়ে সবচেয়ে কম জোর; মনে সবচেয়ে বেশি সাহস। সে তার থলি থেকে ছুটো ইটের মতো শক্ত তিলের নাড়ু বের করে ওদের হাতে দিয়ে বলল, 'বুড়োবাবা বলে যখন যা পাবে সব খেয়ে নেবে। যার গায়ে জোর নেই সে কোনো কাজ করতে পারে না। খাও, দাঁত দিয়ে কুরে কুরে। পেট ভরে যাবে।'

ওরা শুকনো মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। টেমি ওদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বলল, 'তেষ্টা পেয়েছে বুঝি? আমি

জল এনে দিচ্ছি।' সোনদেও ওর হাত থেকে লোটাটি নিয়ে ঝরণার ধারা থেকে জল ভরে আনল। ওরা একটু করে গলা ভেজায়, একটু করে তিলের নাড়ু কুরে খায় আর সকলে ওদের ঘিরে বসে যে যার মোয়া মুড়ি এক মুঠো খেয়ে নিল।

খাওয়া হলে পেমি আর পেমা হঠাৎ ভ্যাঁ করে একটু কেঁদে নিল। তারপর ফিকফিক করে একটু হেসে নিয়ে বলল, 'চল, চল, মায়ের কাছে চল।' ওরা রওনা দিল।

পাহাড়ের নানা জায়গা থেকে সরু সরু নালা নেমে ঝরণার স্রোতে মিলে, ঝরণার জল বাড়ায়। তার কতকগুলি শুকিয়ে গেছে। সোনদেও বলল, 'তোরা সবাই এখানে যে-যার ঘটি ভরে জল নে। পরে আরো কম জল।' পেমি-পেমাকে জিগ্‌গেস করল, 'হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে মন্দির নেই?' 'হুঁ, আছে। সেখানে ঘণ্টা বাজিয়ে ভূত তাড়ানো হয়।' 'মন্দিরে জলের কুণ্ড নেই?' 'হুঁ, আছে। সেখানে ভূতরা জল খায়।' 'তোরা খাস্‌নে?' 'উরি বাবা! মানুষ সে জল খেলে চোখ আঁধা হয়।' সোনদেও বলল, 'তাই বুঝি? আমি ঐ জল খেয়ে দেখব সত্যি আঁধা হয় কি না।' পেমি বড় ভয় পেল, 'না, না, তাহলে তোমার চোখ আঁধা হয়ে যাবে।' পেমা বলল, 'খালি পুরুতের বাড়ির লোকেরা খেলে তাদের চোখ আঁধা হয় না।' সোনদেও একটু হাসল, 'তাই বুঝি? আচ্ছা, দেখা যাবে।'

সারা দিন ওরা পাহাড় চড়ল। যখন আর হাঁটতে পারে না, মাথার চাঁদি গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে, তখন বড় বড় কালো পাথরের আড়ালে একটু বসে জিরিয়ে নেয়। এক চুমুক জল খায়। এক গাল মুড়ি চিবোয়। পেমি-পেমাকে পালা করে ভাগ দেয়। তারপর আবার উঠে হাঁটতে থাকে।

কোমর ধরে যায়, হাঁটু ব্যথা করে, কান বোঁ-বোঁ করে। সেখানে কোন বড় গাছ নেই, ঘাস শুকিয়ে খড়। তারপর সূর্য যখন অনেকটা নেমে গেছে; রোদের তাপ কমে গেছে, তখন দেখে ছুটো পাহাড়ের

মধ্যিখানের খাঁজের মধ্যে বেঁটে বেঁটে গাছপালা, বাড়ির ছাদ, মন্দিরের গম্বুজ।

পেমি-পেমা নেচে ওঠে, 'ঐ—ঐ—ঐ যে! ঐখানে মা আছে! মা আছে!' ওরাও সবাই নেচে ওঠে, 'মা আছে। মা আছে!' সোনদেও বলে, 'যার মা নেই, তারো মা আছে রে। চলে চল্, চলে চল্।'

সেখান থেকে সমস্ত পৃথিবী দেখা যায়। দূরে গোল হয়ে নীল পাহাড়ের সারি আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, তাও দেখা যায়। পেমা বলল, 'এটা খুব খারাপ সময়। এবার ভূতরা গুহা থেকে বেরিয়ে এসে মন্দিরে ঢুকতে চেষ্টা করে। মন্দিরে ঢুকতে পারলে তারা ভগবানকে তাড়িয়ে দেবে। আর সূর্য উঠবে না; ফুল ফুটবে না; ফল ধরবে না; বিষ্টি ঝরবে না; নদী ভরবে না; সব মানুষ জানোয়ার মরে যাবে; তাই ঘণ্টা বাজিয়ে ভূত তাড়াতে হয়। পুরুত বলেছে!' পেমি বলল, 'আজ ঘণ্টা বাজবে না।'

ঠিক সেই সময় বং—বং—বং—বং করে মন্দিরের ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

||||

তাই শুনে সবাই থমকে দাঁড়াল। তবে ভূতরা সত্যি সত্যি ভগবানকে একা পেয়ে, তাড়িয়ে দিয়ে, মন্দির দখল করে, এখন মনের আনন্দে ঘণ্টা বাজাচ্ছে!! 'ও সোনদেও, তাহলে কি হবে? মা-কে যে ওরা খেয়ে ফেলবে!' সোনদেও চটে গেল। 'বাজে কথা রাখ্। পুরুতসুদ্ধু পালিয়েছে, তাই বলে কি গাঁয়ে লোক নেই? ঘণ্টা বাজাচ্ছে তোদের মা!' 'মা যে খোঁড়া, হাঁটতে পারে না। মন্দিরে উঠে ঘন্টি দেবে কি করে?' 'তা বললে তো হবে না। জোয়ান জোয়ান গাঁয়ের লোক, মায়, পুরুতঠাকুর, প্রাণের ভয়ে সবাই নেমে গেল যখন, তখন তোদের মা খোঁড়া পা নিয়েই মন্দিরে উঠে ঘন্টি না দিয়ে করবেটা কি, তাই বল!'

আর কোনো কথা নয়। উঠি পড়ি করে ওরা খাদে নেমে, ও-পারের খাড়া পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে মন্দিরে উঠে দেখে কিনা পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, মা দেবতার মূর্তির সামনে ধূপকাঠি জ্বালছে ওদের দেখে মা-র হাত থেকে ধূপকাঠি পড়ে গেল, চোখে জল এল। পেমি-পেমা মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সকলের কি আনন্দ, কি আনন্দ।

মা বলল, 'গুহা থেকে বুড়ো লামা বেরিয়ে এসে আমার পা ভালো করে দিয়েছেন, জল দিয়েছেন, খাবার দিয়েছেন। বড় ভালো মানুষ তিনি। দু-বেলা তিনিই ঘণ্টা বাজান। সবাইকে তিনি দেখবেন, দেখিস্। ভগবান ওঁকে পাঠিয়েছেন।'

জল দিয়েছেন? জল কোথায় পেলেন? খাদের নদীগুলোতে তো জল নেই! 'ওমা! নদীর জল নয় রে, পুরুতঠাকুরের কূয়োর

জল। কেমন সুন্দর গরম-গরম, ওষুধের গন্ধ লাগা। ও জল খেলে শরীরের সব রোগ তো সেরে যায়-ই, মনের দুঃখ-কষ্টগুলোও চলে যায়।'

পেমি-পেমা শিউরে উঠল। 'কি সব্বনাশ! মা, তুমি ভূত-কুয়োর জল খেয়েছ? তবে তো তোমার চোখ আঁধা হয়ে যাবে! পুরুত বলেছে!' মা বলল, 'কি জানি বাছা, আমার চোখ তো বরাবর করকর করে, হাওয়া লাগলেই জল ঝরে। কিন্তু ঐ জলে চোখ ধুতেই, সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে।' শুনে সবাই অবাক্!

মশালের আলোতে মন্দিরের সামনের চাতালটুকু আলো হয়ে ছিল। জায়গাটা একটু আড়াল করা, নইলে বরফের পাহাড়ের কন্‌কনে হাওয়া অমনি সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যেত। ততক্ষণে ঘণ্টা বাজানো শেষ করে বুড়ো লামা নেমে এসেছেন। দাড়ি-গোঁফ কামানো হাসি-হাসি মুখ, মাথায় কানঢাকা লোমশ টুপি; পায়ের কব্জি অবধি লম্বা জোব্বা গায়ে; লাল টকটক করছে মুখ। এমন চেহারা এরা কখনো দেখেনি। সবাই তাঁর পায়ের কাছে গড় হল। লামা চমকে উঠলেন, 'ওরে ওঠ্ ওঠ্! ভগবানের মন্দিরে আবার মানুষকে গড় করতে হয় নাকি! হেঁটে হেঁটে তো জিব বেরিয়ে পড়েছে। আয় আমার সঙ্গে, গরম জলে হাত মুখ ধুবি চল্। তারপর দুধ আর হালুয়া খাওয়াব।'

বলে কি লামা! সুড়সুড় করে সারি বেঁধে সবাই সঙ্গে চলল। কারো মুখে কথা নেই। লামার চোখের দিকে তাকালে কেমন যেন অন্য কিছু করার কথা মনেও হয় না। কূয়ো থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোয়, তাতে ওষুধ ওষুধ গন্ধ লাগা। লামা পেমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঐ দড়ি-বাঁধা ঘড়া নামিয়ে তোল্ দিকি নি জল। আগে সবাই তেষ্টা মেটাক। তারপর ঐ নালির ধারে হাত-পা-মুখ ধুয়ে ক্লান্তি দূর করুক।' পেমার হাত সরে না। 'কি হল?' লামা বোধ হয় একটু বিরক্ত হলেন। 'পুরুতের বাড়ির লোক ছাড়া কেউ ও জল

ছুঁলে আঁধা হয়।' 'কই, আমি তো হইনি।' 'বোধ হয় শুধু এ গাঁয়ের লোকেরা হয়।' 'তোদের মা-তো হয়নি। বরং তার উল্টো। আমি এসে ওর মুখে জল না ঢাললে আর ওকে বাঁচতে হত না।' পেমা ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।



ঘণ্টা বাজানো শেষ করে বুড়ো লামা নেমে এসেছেন

তখন সোনদেও সবাইকে সরিয়ে দিয়ে, কোনো কথা না বলে,

ঘড়া ঘড়া জল তুলতে লাগল। ওরা আঁজলা আঁজলা জল খেল ; পায়ের ওপর অল্প গরম জল পড়ে সব ধূলো ময়লা ধুয়ে গেল। মনে হল প্রাণ জুড়ুল। সবাইকে জল দেওয়া হলে, লামা ওর হাত থেকে ঘড়া নিয়ে ওকে জল খাওয়ালেন। হাত-মুখ-পা ধুয়ে যখন সবাই ওঁর সামনে দাঁড়াল, লামা সোনদেওর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন, 'তুমি তো অন্যদের মতো নও, তোমার মা-বাবা কোথায় থাকেন ?'

ততক্ষণে ওষুধ লাগা জল খেয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে বাকিদের মুখে কথা ফুটেছে। তারা বলল, 'ওর মা-বাবা নেই, বাবাঠাকুর, বেঁটেরা ওকে গাছতলায় ফেলে গেছিল। বুড়োঠামু রাতে উঠে তুলে এনে মানুষ করেছে।' সোনের মুখটা আরেকটু লাল হল। সে বলল, 'ও-ই আমার মা। আমার অন্য মায়ের দরকার নেই।' লামা বললেন, 'তোমার কপালের মধ্যিখানে ও কিসের দাগ ?' সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, 'বেঁটেদের নখের আঁচড়, বাবাঠাকুর, ও দাগ কখনো ওঠে না। বুড়োঠামু কত ওষুধ করেছে। আমরা কি খাব ?' লামা বোধ হয় অন্য কথা ভাবছিলেন। বললেন, 'যাগে, পেমার মা কি খেতে দেয় দেখ্ গে।'

মন্দিরের মস্ত রান্নাঘর। তার পাশে কাঠের গুদামের ছাদ অবধি শুকনো কাঠ জমা করা। এ দিককার যত লোক দেবতা দেখতে মন্দিরে আসে, তারা সবাই দেবতার নাম করে এক বোঝা কাঠ দিয়ে যায়। তাইতেই মন্দিরের কাজ চলে। রান্নাঘরে মস্ত কড়া চাপিয়ে পেমার মা সুজি রেঁধেছে। চারদিক তার সুগন্ধে মো-মো করছে। বড় টিন থেকে শাদা গুঁড়ো বের করে, গরম জলে গুলে, চিনি মিশিয়ে দুধ বানিয়েছে। তাতে একটু ওষুধের গন্ধ লাগলেও, খেতে সে যে কি মিষ্টি, কি মিষ্টি !

খাওয়াদাওয়ার পর, পুরু করে সুগন্ধি শুকনো-ঘাস-পাতা অতিথিশালার শোবার ঘরে, অতিথিশালার তাক থেকে নামানো বুনো ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি, মোটা মোটা কম্বলে মাথা থেকে পা অবধি

মুড়ে, সে কি ঘুম। পেমা-পেমি আর তাদের মা, তারাও কেউ বাড়ি গেল না। মা বলল, 'সেখানে গিয়ে কি হবে? এই তো আমাদের আসল বাড়ি।'

ঘুম ভাঙল যখন পুব আকাশের সূর্যের আলো লেগে, মন্দিরের চূড়োর মস্ত পেতলের ঘণ্টা বং—বং—বং—বং করে বেজে উঠল। ওপর থেকে হাসিমুখে লামা নেমে এসে, ওদের সবাইকে ডাকলেন। ওরা গুঁড়ো দুধের গোলা দিয়ে, মকাই সেদ্ধ দিয়ে, চিনি দিয়ে পেট ভরে খেয়ে, ওঁর সামনে ঘাসের চাটাইয়ের ওপর বসল। তখন লামা বললেন, 'এখানকার লোকরা যে যা পারল তাই নিয়ে পিট্টান দিল আর তোমরা ছেলেমানুষরা মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে উঠে এলে!! কেন বল তো?' তখন মংলু সোনদেওকে দেখিয়ে দিল। 'ও লিখতে পড়তে জানে, ও বলবে। ও যা বলে আমরা তাই করি।'

সোনদেও সব কথা বলল। বর্ষায় বৃষ্টি হয়নি, শীতে শীত পড়েনি, গ্রীষ্মে গরম পড়েনি। শীতের পাখিরা খালেবিলে নামেনি। খালবিল শুকিয়ে থাক্, তা নামবেই বা কোথায়। শস্যের শীষ ধরেনি; গাছে ফুল ধরেনি; যদি বা ফুল ফুটেছে তো ফল হবার আগেই ঝরে পড়েছে; গোরু-ছাগল বাচ্চা দেয়নি, দুধ শুকিয়েছে। পূজা-আচ্চা, যোগ-যাগ, দান-উপোস, গাঁয়ের মানুষরা আর কিছু বাকি রাখেনি। মঠে, মন্দিরে, পীরের দরগায়, সব থানে ধরণা দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন বুড়োদাদু বলল, 'আমি তো একটাই উপায় দেখি ছেলেপুলেগুলোকে গুহাঘরে বাবাঠাকুরের কাছে পাঠানো যাক। যা দিশে দেবার, তিনিই দেবেন।'

লামা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সব করেছিস্ তোরা?' সোনদেও মাথা নাড়ল, 'না, একটা কাজ করা হয়নি। বিদেশে কোথায় যীশু বলে এক ছুতোরের ছেলে আছেন। তাঁর চমৎকার মন্দির আছে, সেখানে কিন্তু পুজো দেওয়া হয়নি।'

লামা বললেন, 'হুম্। তবে তিনি মন্দিরে-টন্দিরে থাকেন না। আর তোমরা ধপাধপ গাছ কেটে পাহাড় ন্যাড়া করেছ, ধ্বস নামবে না তো কি?' সোন বলল, 'কেউ একটা গাছ কাটলে বুড়োদাদু দুটো গাছ লাগায়। তা এ বছর কোন গাছের শিকড় লাগল না। পেয়ারা হল এত্তটুকুটুকু। আমার মা বলে বেঁটেরা নজর দিয়েছে। কিন্তু বেঁটেরা নেই।'

লামা একটু হাসলেন, 'নেই বুঝি? তা হলে বড় যুদ্ধের সময় কারা এসেছিল পাহাড় ডিঙিয়ে? সে যাক্ গে, তোমরা তাহলে নিতান্ত যাবেই গুহাঘরে বাবাঠাকুরের থানে? পথ চেন?'

'মোড়ল বলেছে শুধিয়ে নিতে।' লামা হো হো করে হাসলেন। 'সব মানুষ ভেগেছে, একটা মুরগিছানা পর্যন্ত রেখে যায়নি, তা শুধোবে কাকে শুনি? তবে আমি সে পথ চিনি।'

ছেলেমেয়েরা অবাক্ হয়ে খাড়া পাহাড়ের গায়ের দিকে চেয়ে রইল। আর ওপরে উঠতে হলে, অন্য পথ ধরতে হবে। সোনদেও বলল, 'কি করে যাব আমরা? পথ তো নেই।' 'পথ না থাকলে কি করতে হয়?' সোনদেওয়ের হাসি পেল, 'পথ না থাকলে, পথ তৈরি করতে হয়। তাও না পারলে, অন্য পথে যেতে হয়। ছাড়তে হয় না।' লামা বললেন, 'তোমার বয়স কত?' সোনদেও বলল, 'মা বলে দশ-এগারো, বুড়োদাদু বলে চোদ্দ।'

লামা সবাইকে ডেকে বললেন, 'আছে পথ। তবে সে পথে যাবার সাহস আছে তোমাদের? শত্তুরের তৈরি লুকনো পথ। যে পথে আমি এসেছি। পারবে যেতে?'

অমনি সোনদেও ওঠে তাঁর পাশে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে মংলু, মুংরি, বুধন, বুধো, মাধো, চম্পা, টেমি, গুঁপো, ল্যাংড়া ঘাড় উঁচু করে সারি বেঁধে ওর পাশে দাঁড়িয়ে গেল। পেমি-পেমা ফ্যালফ্যাল করে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মা তাদের ঠেলে দিয়ে, নিজেও উঠে দাঁড়াল, 'চল সবাই। আমি দেখাশুনো করব।' সোনদেও বলল, 'তিনি বড়দের

সঙ্গে দেখা করবেন না।' 'না করলেন। তোরা দিশে নিবি, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।'

সঙ্গে সঙ্গে সোরগোল পড়ে গেল। মন্দিরের ঘণ্টা কে বাজাবে, যদি সবাই চলে যায়? লামা বললেন, 'আমি বাজাব। তোদের পথ বাতলে দিয়ে আমি এদিক সামলাব। শুনে ওরা হাঁ! বলেন কি লামা? সবাই যদি চলেই গেল তাহলে সামলাবেন আবার কাকে? লামা হাসলেন, 'কেন, কাল যে বড় বলছিলি ঘণ্টা না বাজালে ভূতরা ভগবানকে মন্দির থেকে বের করে দিয়ে, নিজেরা জাঁকিয়ে বসবে?'

সোন বলল, 'ওরা কিছু জানে না, তাই অমন বলেছে। ভগবান নিজেই ভূত ভাগাবেন। আপনিও চলুন।' 'কেন ভয় পাচ্ছিস্ বুঝি?' 'একটু একটু পাচ্ছি। এতগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহলে, মায়ের সঙ্গে ওরা সবাই থাক, গুহার মধ্যে যথেষ্ট টিনের খাবার রেখেছি। কূয়োয় অগাধ জল আর ভগবান নিজেই যখন ভূত তাড়াবেন, তখন আর ভাবনা কিসের? তাছাড়া পথে বড় কষ্ট, ওরা পারবে কেন? তুমি আমি দুজনে যাই।'

এ-কথা শুনে, বনগাঁও থেকে আসা বাকি ন'টা ছেলে-মেয়ে এমনি চ্যাচামেচি করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত পেমি-পেমা আর ওদের মা-কে মন্দির পাহারায় রেখে, বাকি সবাই রওনা হয়ে গেল। পেমি-পেমার চোখে জল। কিন্তু যখন শুনল ঘণ্টা দেবার ভার তাদের উপর আর মন্দিরের মধ্যে বাস, তখন খুশিও হল কম নয়। পুরুত ওদের মন্দিরের বাইরের ঘরে দাঁড় করিয়ে রাখত। মধ্যিখানে একটা মোটা সোনালি দড়ি বাঁধা; সেটি কাউকে ডিঙোতে দিত না; কারো ডিঙোবার সাহস-ও হত না। যাবার আগে সেই দড়িটা খুলে, দেবতার মূর্তির পিছনে সোনদেও রেখে গেল।

লামা বললেন, 'সকালের খাওয়া-দাওয়া, ব্যবস্থাপনা সব সারা। তোমরা যেমন যে-যার নিজের ঝোলায় খাবার-দাবার নিয়ে এসেছিলে, তেমনি সে ঝোলা রেখে, গুহার মধ্যে থেকে সবাই একটা করে ঝুলি

তুলে নিয়ে চল। পথে যা কিছু দরকার হবে, ওরি মধ্যে পাবে। তবে পিঠে বাঁধা ঝোলা এগুলো, সুড়ঙ্গ বেয়ে উঠতে হলে দুটো হাতই কাজে লাগাতে হবে।'

ততক্ষণে ওরা গুহায় গিয়ে ঢুকেছে। বেলা দশটার রোদ পূব দিকের গুহা-মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। দেওয়ালে সারি সারি তাকে সাজানো রাশিরাশি সবুজ ক্যাম্বিশের ঝুলি, জিনিসপত্রে বোঝাই। সেগুলিকে পিঠে বেঁধে নিতে বেশিক্ষণ লাগল না।

সোন বলল, 'এই দু-তিন দিনে কি করে তুমি এত বন্দোবস্ত করলে?' লামার হাসিতে চারদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। 'আমি করেছি ভেবেছিস্ নাকি? বললাম না শত্তুররা করে রেখে গেছিল। নিজেদের জন্য। আমরা কাজে লাগাচ্ছি। আয়, উঠতে আরম্ভ করা যাক্। তিন দিনের পথ এক দিনে যাওয়া যায়। এই পথেই আমিও এসেছি।'

ল্যাংড়া জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে এসেছ লামাবাবা, স্বর্গ থেকে বুঝি?' 'দূর বোকা, তাহলে এত বন্দোবস্তের কোনো দরকারই হত না। আয়, কোন ভয় নেই। অন্ধকার বড় ভাল জিনিস। জন্মাবার আগে মানুষের ছেলেমেয়েরা কেমন নিরাপদে নিশ্চিন্তে ঘুটঘুটে অন্ধকারে থাকে, জানিস্ না?'

'পথ কোথায় শেষ হবে?' 'কেন, বাবাঠাকুরের থানে। সেইখানেই না যাবি বলে বেরিয়েছিস্ তোরা?' আর প্রশ্ন নয়। ওরা উঠতে আরম্ভ করল। সোনদেও সবার আগে। বুড়ো লামা সবার শেষে। তবে আবার ভয়টা কিসের? পথ তো নয়। বেশ বড়সড় একটা সুড়ঙ্গ পাক খেতে খেতে সমানে উপরে উঠে গেছে। কিছুটা পাহাড়ের গায়ে পাথরে কাটা ধাপ, কিছুটা লোহার সিঁড়ি। খোলা দিকে শিকল বাঁধা। একটা মোড় নিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওরা আঁৎকে উঠল। অমনি পিছন থেকে লামার গলা শোনা গেল, 'ভয়ের দিকে এগিয়ে গেলেই ভয় পালায়, এটা মনে রাখিস্। তবে পা ফেলতে হয় সাবধানে।'

IIIII

দলের মধ্যে তিনটে মেয়েঃ—মুংরি, চম্পা, টেমি। তাদের সাহস সোনদেওয়ের পরেই। অন্ধকার হাতড়ে মুংরি বলল, 'এই নাকি ভূত-গুহা! ভূতের ভয়ে এর মুখটা পাথর দিয়ে ঠাসা থাকত, পেমি বলেছে। লামা তুমি জাদুবলে সেটা খুলে নেমে এসেছ, পেমি বলেছে।' লামা বললেন, 'হুম্। ঠিক জাদুবলে নয় অবিশ্যি, লোহার ডাণ্ডার খোঁচায়। ঐ একই জিনিস।' সোন বলল, 'অন্ধকার তাকে মোটা মোমবাতি পেয়েছি, লামা।' 'দেশলাইও আছে পাশে, ধরিয়ে দে। তারপর সেই আলোতে উঠতে থাক্। আরো উঁচুতে আরেকটা পাবি। সেটাও ধরাবি। আমিও তখন এটা নেবাব। সারা রাস্তা এমনি করে আলো পাওয়া যায়, শিখে রাখ। তবে মোমবাতি জ্বললে বাতাসের অক্সিজেন পুড়ে যায়, ভুলিস্ না। তার চেয়ে এটা ভালো, বাতাস পোড়ে না।' এই বলে জোব্বার ভাঁজ থেকে এক বিঘৎ একটা চোঙামতো বের করে, বোতাম টিপলেন। অমনি চারদিকটা দিনের মতো আলো হয়ে গেল। ওরা সবাই হাঁ।

সোন বলল, 'ওকে টর্চ বলে। দাদু একটা এনেছিল বর্মা থেকে। এখন আর জ্বলে না। দাদু বলে ওর আগুন পুড়ে গেছে।' 'আর দেরি নয়, এখন থেকে খালি ওঠা। খালি ওঠা।'

সে কি যে সে ওঠা! উঠছে তো উঠছেই। কোথাও ঢাল বেয়ে, কোথাও সিঁড়ি ভেঙে, কোথাও শেকল ধরে ঝুলে। এক জায়গায় সোন আগে শেকল বেয়ে উঠে, কপিকলের হাতল ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে জল তোলার মতো করে একে একে সবাইকে তুলল। কখনো

মোমবাতির আলোয়, কখনো টর্চ জ্বেলে, কখনো শুধু অন্ধকারে হাতড়ে। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার চোখে সয়ে গেল। তারপর মনে হতে লাগল হয়তো ওপর থেকে একটু একটু আলো আসছে।

পথ আরো খাড়া হল। কোথাও সুড়ঙ্গের গায়ে পাক খেয়ে উঠেছে। কোথাও খানিকটা ঢালু হয়ে ডাইনে এগিয়ে, আবার ঢালু হয়ে বাঁয়ে এগিয়ে, অল্প সময়ে অনেকটা উঠে যাচ্ছে। তারপর ল্যাংড়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল, 'কি খাব?' লামা জোব্বা থেকে চমরি-গাইয়ের শুকনো দুধের গুলি বের করে, হাতে হাতে বিলি করলেন। মুখে রাখতেই গলে ক্ষীরের মতো হল। সেটি ফুরোতেই গুঁপো বলে, 'জলতেষ্টা পেয়েছে।' লামা বললেন, 'পিঠের ঝোলার বাইরে খোপ। তাতে কৌটো করে লেবু-ল্যাবেঞ্চুষ আছে। চুষে খাও, তেষ্টা যাবে।' লেবু-ল্যাবেঞ্চুষ জানে না ওরা। ওদের গাঁয়ে ও-সব পৌঁছয় না! খেয়ে দেখে কি ভালো কি ভালো। এমনি করে আরো অনেকটা উঠে গেল।

কত সময় গেল কেউ জানে না। ঘড়ি বলে কিছু নেই কারো। সূয্যি দেখে ওরা সময় ঠিক করে। তা এখানে চাঁদ-সূয্যি কোথায় পাবে। শরীরটাই একমাত্র মাপ। ধাপে ধাপে উঠে উঠে উঠে উঠে পায়ের গুলি ইঁটের মতো; ঝুলে ঝুলে দু-কাঁধ টনটন। পথ আর ফুরোয় না। সোন বলছিল, 'কোন সময়ে না পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু চূড়ো এভারেস্ট ফুঁড়ে তিব্বতের আকাশে মুণ্ডু বেরোয়!' শুনে ওদের কি ভয়! 'তিব্বতে বেঁটেরা থাকে, না সোন? যদি আমাদের খেয়ে ফেলে?'

নিচে থেকে লামা হেসে বললেন, 'দূর বোকা, দুধের গুঁড়ো দিয়ে চায়ের গুঁড়ো দিয়ে নুন দিয়ে তৈরি হাম্পা পেলে ওরা আর কিছু চায় না। চান না করা ছোট ছেলেমেয়ে দেখলে ওদের বমি আসবে।' শুনে ওরা কি খুশি! 'আমাদের দেখলে ওদের বমি আসবে! কি মজা, কি মজা!' সোন সঙ্গে থাকলে সব কিছুতেই মজা। তার ওপর

লামা থাকলে তো কথাই নেই। হাসতে হাসতে আরো অনেকটা উঠে পড়ল ওরা।

গুঁপো হঠাৎ থমকে থেমে বলল, 'সুড়ঙ্গের ও-মুখটা যদি বড় বড় পাথর দিয়ে বন্ধ থাকে? তাহলে বেরুব কি করে?' কেউ একটা ভয়ের কথা বললেই হল! সব ক-টা প্যাঁ-পোঁ লাগিয়ে দেবে। সোন রেগে গেল, 'শুনলে তোমরা যে লামা এই পথেই এসেছেন। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে নিচেকার ভূত-গুহার মুখ খুলেছেন। আবার ও কি কথা!' ল্যাংড়া বলল, 'লামা নেমে গেলে পর যদি দুষ্টু লোকেরা মুখ বন্ধ করে দিয়ে থাকে?'

নিচে থেকে লামা বললেন, 'তা দেয়নি। তাহলে সুড়ঙ্গের হাওয়া এত মিষ্টি হত না। টের পাচ্ছিস্ না, নিচে থেকে উপরে কেমন হাওয়া চলাচল করছে?'

মাধো বলল, 'আমরা ওখানে পৌঁছবার ঠিক আগে যদি কেউ পাথর দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেয়?' সোন খুব বিরক্ত, 'তাহলে লামা নিচের মুখ যেমনি ডাণ্ডা খুঁচিয়ে খুলেছিলেন, তেমনি করে খুলে দেবেন।' বুধো বলল, 'যদি আরো শক্ত করে এঁটে বন্ধ করে?' লামা বললেন, 'তাহলে আরো জোরে খুঁচোব। ডাণ্ডা আমার সঙ্গেই আছে। জানতো যত পেছিয়ে ধরা যায়, তত জোর পাওয়া যায়।' সোন বলল, 'একেবারে হাতলের কাছে ধরলেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি জোর পাবে, না ঠাকুর?' লামা হাসলেন, 'কোথা দিয়ে দুষ্টু লোকরা আসবে শুনি? ওপরের মুখ তো বুড়োঠাকুর নিজে আগলান। তাঁর সঙ্গে কে পারবে? কত অংক জানেন ভাবতে পার না।'

সোন ছাড়া ওরা কেউ দশের বেশি গুণতে জানে না। আগে লিখতেও জানত না। আঠার খবর আনতে গিয়ে ফাঁকতালে মাটিতে আঁচড় কেটে সোন ওদের এক থেকে দশ গুণতে আর লিখতে শিখিয়েছে। বুধন বুক ফুলিয়ে বলল, 'আমরাও অংক জানি। জান, সোন একশো অবধি গুণতে পারে। তুমি পার?'

লামা বললেন, 'এখান থেকে সিঁড়ি আরম্ভ। এসো তো দেখি কতগুলো গুণতে পারি। এক দুই তিন চার—' গুণে গুণে উঠছে তো উঠছেই। শেষটা একশো-তিন, একশো-চার করে করে এক সময় দুশো হল। তখন আর কেউ চলতে পারে না। খুদে একটা চাতালের মতো জায়গায় পৌঁছে ধপাধপ সবাই বসে পড়ল। বুকগুলো হাপরের মতো উঠছে পড়ছে। এত হাঁপ ধরেছে যে দম আটকে আসছে। লামা বললেন, 'উঁহু, মুখ খুলে নিশ্বাস নিলে হাঁপ ছাড়বে না।' মুখ বুজে ফেলল সবাই ; ক্রমে দম ফিরে এল। চারদিকে চেয়ে দেখল।

চেয়েই হাত পা ঠাণ্ডা ! ও আবার কি ! সুড়ঙ্গের দেয়ালে জোড়া চোখ মিটমিট করছে! চম্পা লাফিয়ে উঠল, 'গিরগিটি! মহা-গিরগিটি! ভূত-গুহায় তার মূর্তি খোদাই করা আছে, দেখেছি।' লামা টর্চ বের করে দেয়ালের গায়ে আলো ফেললেন। ওমা, দেয়ালের গায়ে খোপ কাটা, খোপে খোপে ছাই রঙের প্যাঁচা মিটমিট করে চাইছে। বড় প্যাঁচা, মাঝারি প্যাঁচা, মায়ের পাশে খুদে প্যাঁচা। আলো দেখে আস্তে আস্তে হুম্-হুম্ শব্দ করে, পাখা মেলে সব ওপর দিকে উড়ে পড়ল ! সমস্ত সুড়ঙ্গ গুম্‌গুম্ করে উঠল। সে গুম্‌গুম্ শব্দ কত নিচে ভূত-গুহার মুখের কাছে পেমি, পেমা আর ওদের মা-ও শুনতে পেয়েছিল।

প্যাঁচারা উড়ে যেতে না যেতে, সমস্ত চাতালটি দুলে উঠল! ছেলেমেয়েগুলো চ্যাঁচাতে লাগল 'ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!' ভূমিকম্প ওদের গাঁয়ে নিত্য হয়, ও সবে ওরা ভয় পায় না। কিন্তু এ আবার কি! ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দুলতে দুলতে সমস্ত চাতালটি ওপরে উঠে যেতে লাগল!

কারো মুখে কথা নেই। ভয়ে চোখ বুজে, মুখ বুজে সবাই কাঠ। হঠাৎ ঘট্ করে চাতাল থামল, গায়ে রোদ লাগল, চোখে আলো লাগল, মুখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। ওরা ওপরে এসে পৌঁছেছে! সেখানে এক সুন্দর গুহায় চাতাল এসে থেমেছে। গুহার দেয়ালে

গিরগিটির পুরনো নক্সা। লতাপাতার ফাঁক দিয়ে মহা-গিরগিটি উঁকি মারছেন। চম্পা টেমি নমো করে বলল, 'নমো কর, নমো কর, এ সুড়ঙ্গটা বড় পবিত্র জায়গা!'



সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এল রোগামত
লালমুখো ঝাঁকড়া চুল এক বুড়ো

লামা বললেন, 'তাই নাকি রে? বড় যুদ্ধের সময়ে শত্রুরা এই

সুড়ঙ্গ করেছিল, নিচে নেমে দেশ দখল করবে বলে। গুহাটা আগেও ছিল, সন্ন্যাসীরা এখানে ধ্যান করতেন। সুড়ঙ্গটা আমরা সারিয়ে সুরিয়ে নিয়েছি। জিনিসপত্রের বেশির ভাগ ওরাই রেখেছিল। এবার ওঠ্‌, আমরা পৌঁছে গেছি!'

ছেলেমেয়েগুলো কলকল করে নদীর স্রোতের মতো ছুটে বেরিয়ে এল, 'এসেছি। এসেছি! এই তো বুড়ো-ঠাকুরের থান! এখানে উপায় পাব! আবার ঝরণায় জল নামবে, গাছের শেকড় গজাবে, ফুল হবে, ফল হবে, মুরগিরা ডিম দেবে, ছাগলরা বাচ্চা দেবে! তুমি এখানে বস লামা, বুড়োঠাকুর বুড়োদের সঙ্গে কথা বলেন না!' শুনে লামা তো অবাক! 'বলিস কি রে তোরা? ও সোন, এবার তাহলে যা করবার কর!' সামনেই আরেকটা গুহার মুখ।

সোন সেই গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে মুখের কাছে দু-হাত তুলে শাঁখের মতো করে ডাক দিল, 'ও বুড়োঠাকু—উ—উ—র! বাইরে এসো! আমরা বিধান নিতে এসেছি—ই—ই!'

লামা ছুটে এলেন, 'এ্যাই! চুপ, চুপ, অঙ্ক কষছেন, রেগে যাবেন। দাঁড়া, দেখি কি করতে পারি।' লামা গুহামুখের পাশে আরেকটা ছোট গুহা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুহামুখ দিয়ে প্রায় ছিট্‌কে বেরিয়ে এলো রোগামতো লালমুখো ঝাঁকড়াচুল এক বুড়ো।

রাগে ফেটে পড়লেন, পাতলা পাতলা দাড়িগুলো বেড়ালের গোঁফের মতো খাড়াখাড়া হয়ে আছে, চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে, হাতে একটা ছুঁচলো পেন্‌সিল। পেন্‌সিল দেখেনি ওরা কখনো। ভাবল হয়তো ছোট বন্দুক! বন্দুক দিয়ে কি হয় তাও ভালো করে জানে না। বলিনি সব আকাট মুখ্যু, দশের বেশি গুণতে জানে না, দাঁড়ি কেটে দুধের হিসাব রাখে।

বুড়ো ওদের দেখেই চিড়বিড় করে জ্বলে উঠল। খেঁকিয়ে বলল, 'হল্লা করছে কারা এই অসময়ে? ওরা কি জানে না সূয্যি ডোবার

আগে হল্লার সময় নয় ? তখন আমি চোখে ভুল দেখি, অংক ভুল হয়ে যায়। তখন যত খুশি হল্লা করিস্। কি চাস্ তোরা ? আমার এরাও দেখছি বেশ ! যে-সে গর্ত্ত ফুঁড়ে উঠে আসবে, কিচ্ছুটি বলবে না ! বলিহারি আক্কেল ! এখানে হাত থেকে পেন্সিল পড়ে শীষ ভেঙে যাওয়াতে বুড়ো থামল।

সোন পেন্সিল কুড়িয়ে দিতে, একটু নরম হয়ে আবার বলল, 'আহা কি চাস্ তাই বল্ না। যে-সে এসে জ্বালাবে এতো মজা মন্দ না !' তখন সোনদেও-ও একটু গরম দেখিয়ে বলল, 'যে-সে নই আমরা, বাবাঠাকুর। নেহাৎ ঠেকায় পড়ে উপায় নিতে এসেছি অনেক নিচে থেকে। উপায় না নিয়ে যাব না, এই বলে রাখলাম। আর আমরা পারছি না ঠাকুর, কতকাল চান করিনি, ভাল করে ঘুমোইনি, হাতে-পায়ে খিল ধরে আছে। আমরা সহজে যাব না।'

তোতাপাখির মতো ছেলেমেয়েগুলো চ্যাচাতে লাগল, 'যাব না, যাব না আমরা ! ঘর ছেড়েছি, বেঁটেদের ভয় করিনি—।' বুড়ো তো অবাক, 'বেঁটেদের ? কই, তোদের ছাড়া তো আর বেঁটে দেখিনি ! আর বেঁটে নেই রে ব্যাটারা, সব টেনে লম্বা দিয়েছে !' বলে ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে লাগল। শুনে ছেলেমেয়েরা মহা খুশি। 'এঁ্যা, বেঁটে নেই তাহলে ? কি মজা ! তাহলে এবার বাড়ি ফেরা যাক—!' বুড়ো চোখে চশমা এঁটে ওদের আরেকবার ভাল করে দেখে বলল, 'সেই ভালো। বাড়িই ফিরে যা। যে কাজের জন্য তোরা এসেছিস্ বলে সন্দেহ হচ্ছে, তার পক্ষে তোরা বড্ড ছোট। তোরা পারবিনে। বাড়ি যা, আমি অংকটা শুধরোই গিয়ে। যাবার আগে আমার পেন্সিলের শীষটা কেটে দিয়ে যাস্।'

সোনদেও ওর ধারালো ছুরিটা বের করে পেন্সিলটাকে চক্ষের নিমেষে ছুঁচোল করে কেটে দিয়ে বলল, 'যাও বললেই তো যাওয়া যায় না, বাবাঠাকুর। তুমি বলছ আমরা বড্ড ছোট, কাজটা পারব না। তোমরা বুড়োরাই কি খুব পেরেছ ? তাহলে সব গোলমাল

হয়ে যাচ্ছে কেন ? বর্ষায় বিষ্টি নেই, শীতে ঠাণ্ডা নেই, গ্রীষ্মে গরম নেই, হেমন্তে বুনো হাঁসরা আসেনি, পাহাড়ে ধ্বস নেমেছে, ঝরণা শুকিয়েছে, গাছ মরেছে, চারা গাছের শেকড় লাগেনি, গাঁ খালি করে লোকে নিচে নেমে গেছে। সবাই বলছে দেবতা কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ?'

বুড়োর কি রাগ ! 'যাবে না তো কি করবে ? তোদের জ্বালায় পৃথিবী চুপসে যাচ্ছে, ফোঁপরা হচ্ছে, কোনদিন না হিমালয় পাহাড় টোল খেয়ে ভেতরে ঢুকে যায় ! অমনি বরফ গলে ভুস্‌ভুস্ করে সারা দেশের ওপর দিয়ে বান ডেকে যাবে, সব চ্যাপ্টা একাকার সমুদ্দুর হয়ে যাবে, তার মধ্যে থেকে গ্যাস্‌গুলোও উপে যাবে ! আমি অংক কষে স্পষ্ট করে এ-সব দেখতে পাচ্ছি আর তোরা যে দিনে রাতে কয়লা তুলছিস্, তেল তুলছিস্, নলে করে গ্যাস্ চালান দিচ্ছিস্, জ্বালাচ্ছিস্, পোড়াচ্ছিস্, সব খেয়ে পরে শেষ কচ্ছিস্—এ বিষয়ে ভেবেছিস্ কখনো ?'

সোনদেও অবাক্ হল, 'তাই নাকি ? আমরা তো এ-সমস্ত খপর পাইনি। পেলে নিশ্চয় মানা করতাম। আমার বুড়োদাদু কক্ষণো এমন করতে দিত না। জান, আমরা কিচ্ছু নষ্ট করি না, সব পুঁতে রাখি। দাদু বলে, ওতে সার হয়, শস্য বাড়ে, শরীর ভালো হয়। আমরা গাঁয়ে ফিরে দাদুকে ঐ লোকগুলোর কথা বলব, দাদু মানা করে দেবে। এবার উপায় বলে দাও।'

বুড়ো তো অবাক্, 'উপায় ? কিসের উপায় ?'

সোন বলল, 'ঐ যে-সব সব্বনাশ হচ্ছে তা বন্ধ করার উপায়। না বললে আমরা ফিরে যেতে পারব না। বনের ধারে বুড়োদাদু, মা, এরা সব তাঁবু গেড়ে বসে আছে।'

বুড়ো আঁৎকে উঠল, 'এ্যাঁ। বল কি। তারাও নিশ্চয় বেজায় হল্লা করে। তাহলে আমার অংক কষা হয়ে গেল। কিন্তু আমি তো উপায় বাৎলাবার মালিক নই। আমি খালি বলতে পারি কেন

এমন হচ্ছে আর এ-ভাবে চললে আরো কি কি হবে। সব ব্যাপারের গোড়ায় যে মস্ত একটা অংক আছে, আমি শুধু সেটাকেই বুঝতে শিখেছি। সে আর তোদের কি বোঝাব, যা মুখ্যু তোরা, দশের বেশি গুণতে পারিস্ না—'

মংলু মুংরি বুধন বুধো মাধো চম্পা টেমি গুঁপো ল্যাংড়া তেড়ে উঠল, 'সোন পারে, সোন একশো অবধি গোণে। ও আমাদের গাঁয়ের সব হিসেব কষে দেয় আজকাল।' বুড়ো তখন সোনকে কাছে ডেকে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর বলল, 'কপালের মধ্যিখানের কাটাটা কি করে হল?' মংলুরা একসঙ্গে বলল, 'বেঁটেরা আঁচড়ে দিয়েছিল, ঠাকুর—' বুড়ো সেদিকে কান না দিয়ে, সোনের মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলল, 'উপায়, আমি করতে পারব না, ভাই। তবে যেখানে গেলে কাজ হবে সেখানে তোমাদের পাঠিয়ে দিতে পারি। হাওয়ার দাঁড়ি কাকে বলে জান?' ওরা কিছুই জানে না; দশ জানে, কিন্তু দশমিক পর্যন্ত জানে না। ভেউ ভেউ করে সোন বাদে সব কেঁদে উঠল, 'না জানি না। তবে কি উপায় হবে না?' খালি সোন বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'যখন জন্মায় তখন পণ্ডিতরাও কিছু জানে না। পরে সব শিখে নেয়। আমরাও শিখে নেব। তুমিই বল হাওয়ার দাঁড়ি কাকে বলে।'

বুড়ো খুশি হল, 'দাঁড়ি হল গিয়ে দাঁড়িপাল্লা, যা দিয়ে ওজন বোঝা যায়, টাল যদি ঠিক থাকে। টালের গোলমাল হলে দাঁড়িপাল্লাও কোনো কাজে লাগে না। মানুষের দাঁড়িপাল্লাও না, আর হাওয়ার যে দাঁড়িপাল্লা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু যেটার টাল ঠিক না থাকলে সব গোলমাল হয়ে যায়, সে-ও না। এর বেশি কি বুঝবি তোরা? টান করে লেত্তি পেঁচিয়ে ছেড়ে দিলে লাট্টু কেমন ঘোরে দেখেছিস্? কিন্তু টানের জোর কমে গেলেই ল্যাগব্যাগ করে পড়ে যায়। তোদেরো না তেমনি হয়।'

কতক বুঝল কতক বুঝল না ওরা। যতটা ভয় পাওয়া উচিত

ছিল, ততটা পেল না। সোন বলল, 'তুমি যদি আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দাও, দেখি কি করতে পারি। লাট্টু ঘোরাই তো আমরা সবাই। লেত্তিটা বুঝি হাওয়ার তৈরি, তাই হাওয়ার দাঁড়ি? তাহলে তো চোখেও দেখা যাবে না। আচ্ছা, যাই তো সেখানে। কিন্তু যাব কেমন করে? আর তো পথ নেই।'

'পথ না থাকলে কি করতে হয়?' 'নতুন পথ দেখতে হয়।' 'ঠিক তাই। ঐ দেখ, লামা তোমাদের জন্য উড়োজাহাজ এনেছে। ওতে চেপে তোমরা সেখানে এক ঘণ্টায় চলে যাবে।'

মস্ত একটা ফড়িং এর মতো নিঃশব্দে এক উড়োজাহাজ এসে চাতালের উপর নামল।

||||||

উড়োজাহাজ তো নয়, যেন প্রকাণ্ড এক ফড়িং। তার চারটে ডানার আর সারা গায়ের মধ্যে দিয়ে আলো যায়! যেন জল দিয়ে তৈরি, হাওয়া দিয়ে কে বানিয়েছে। রোদ লেগে ঝিমঝিম ঝমঝম করছে। কিন্তু ভেতরে কি আছে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এমন জিনিস ওরা



উড়োজাহাজ তো নয়, যেন প্রকাণ্ড এক ফড়িং

ভাবতে পারে না। আকাট মুখ্যু সবাই, লিখতে পড়তে জানে না, সোন যা বলে তাই মেনে নেয়। প্ল্যাস্টিক দেখেনি; কাচ একটাই

দেখেছে, পাহাড়তলীর পোস্টমাস্টারের ঠুলিতে বসানো। তাই দিয়ে নাকি অন্ধ মানুষও দেখতে পায়, মোড়ল বলেছে। সোন বলে ঠিক তা নয়, যার চোখে ছানি, কিংবা যার চোখ নেই সে দেখতে পায় না ; যার চোখ খারাপ সে পায়। ওরা তাই মেনে নেয়। কিন্তু এ আবার কেমন কাচ ? ওরা সোনের মুখের দিকে চায়।

সোন অবাক হয়ে কাচের উড়োজাহাজ দেখছে। এমন সময় উড়ো-জাহাজের গায়ে একটা দরজা খুলে গেল, একটা সিঁড়ি নেমে এল। সব কাচের তৈরি। সিঁড়ি দিয়ে সুন্দর একজন মানুষ নেমে এল। তার কালো চুল, পাটকিলে চোখ, সোনার মতো গা, শাদা মিলিংটারি পোশাক পরা। মিলিংটারি পোশাক ওরা সবাই দেখেছে। মাঝেমাঝে ওদের গাঁয়েও মিলিংটারি এসে এ-কথা ও-কথা জানতে চায়। কম্বল দেয়, টিনের দুধ দেয়। মিলিংটারিরা ভালো হয়। এই সুন্দর মিলিংটারিও নেমে এসে, ওদের দেখে হাঁ। বুড়ো বলল, 'এর সঙ্গে যাও তোমরা। কোনো ভয় নেই। উড়োজাহাজ চালিয়ে তোমাদের নিয়ে যাক। এ উড়োজাহাজ এমন জিনিসে তৈরি যে পড়লেও ভাঙে না। এর বাইরে থেকে ভেতর দেখা যায় না, কিন্তু ভেতর থেকে বাইরের সব দেখা যায়। ওর গায়ে অস্ত্র লাগলে ঠিক্‌রে পড়ে। নিরাপদে যাও।'

কিন্তু সুন্দর মানুষটির কোনো দিকে চোখ নেই। এক-পা দু-পা করে সোজা সোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সোনের থুতনির নিচে হাত রেখে, মুখখানি তুলে বলল, 'তোমাকে আমি চিনি। ১৩ বছর আগে ধাইয়ের হাত থেকে কাঁচি পড়ে তোমার কপাল কেটে ঐ রকম পদ্মকুঁড়ির মতো দাগ হয়ে গেছিল। সাত দিন পরে পট্টি খুলতে দেখেছিলাম। চল এবার, অনেক কাজ বাকি আছে।' তারপর সোনের দিকে ফিরে আবার বলল, 'তেরো বছর ধরে তোমাকে খুঁজেছি। উড়োজাহাজ চালাতে শিখেছি। এ দিককার সব ভাষা শিখেছি। তা আর দেরি নয়, উঠে পড়, উঠে পড়।' তারি মধ্যে

মনে হল পাটকিলে চোখে জল চিকচিক করছে। সোন কি যে বলবে ভেবে পেল না।

তাড়াতাড়ি সবাই উঠে পড়ল, সিঁড়ি তুলে ফেলা হল। উড়ো-জাহাজে ঐরকম শাদা পোশাক পরা আরো ক-জন লোক ছিল। তারা দরজা বন্ধ করে দিল। মাঝখানে পথ, দু-পাশে বসার জায়গা। যে যেখানে পারল বসে পড়ল। নিচে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে বুড়ো পণ্ডিত রুমাল নাড়তে লাগল। উড়োজাহাজে তার নাকি চোখ পিট্‌পিট্ করে, ঘড়ি দেখবার অসুবিধা হয়। ওরাও প্রাণপণে হাত নাড়ল। সোন বলল, 'উনি কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বাইরে থেকে দেখা যায় না।' একবার মনে হল সামনের ঘরে একটা দরজা খুলল, বন্ধ হল। কখন উড়োজাহাজ উড়ল, বোঝা গেল না। ওরা এ জানালা দিয়ে দেখে, ও জানালা দিয়ে দেখে। উড়োজাহাজ নড়ছে টের পাওয়া যায় না। ওপরে মেঘ, তলায় মেঘ। ঠাণ্ডা লাগে না, গরম লাগে না। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব পাহাড়ের চূড়ো চোখে পড়ে। উড়োজাহাজীরা ল্যাবেঞ্চুষ খেতে দেয়। এমনি ভালো ল্যাবেঞ্চুষ ওরা জন্মে খায়নি। এক ঘণ্টা বাদে, শাদা পোশাক পরা একজন এসে ওদের কোমরের বেল্ট এঁটে সীটের সঙ্গে আটকে দেয়। তারপর এতটুকু ঝাঁকানি নেই, কিছু না, উড়োজাহাজ সেই অদ্ভুত জায়গায় নেমে পড়ল।

অদ্ভুত বলে অদ্ভুত। চারদিকে বরফের পাহাড় মধ্যিখানটা একটু চ্যাপ্টামতো। সেখানে একটা টিলা। টিলার নিচে উড়োজাহাজ নেমেছে। অমনি দরজা খুলে গেল। সিঁড়ি নামল। শাদা পোশাক পরা তিনজন লোক ওদের হাত ধরে নামিয়ে আনল। সবার শেষে সুন্দর মানুষটিও নামল। এতক্ষণে বোঝা গেল এ মানুষটি পুরুষ নয়, মেয়ে। ওরা সবাই এতক্ষণ পরে মেয়েমানুষ দেখে মাসি মাসি করে তাকে জড়িয়ে ধরল। খালি শোন একটু দূরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কেমন গোলমাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল বুড়ো

দাছুর ঘরের দেয়ালে লাগানো ভাঙা আয়নার টুকরোয় এই মানুষটির মুখের মতো মুখ দেখেছে।

আরো অদ্ভুত কথা। ওরা যতজন উঠেছিল, নামল কিন্তু একজন বেশি। সবাই নেমে গেলে, উড়োজাহাজের সিঁড়ি বেয়ে, খচমচ করে ব্যাগ্ বগলে নেমে এল বুড়ো পণ্ডিত। তার এক হাতে সেই পেন্‌সিলটা। তার শীষ আবার ভেঙে গেছে। কোনো কথা না বলে পণ্ডিত সেটা বাগিয়ে ধরল। সোন তার ছুরি দিয়ে ছুঁচল করে দিল। ছেলেমেয়েরা অবাক্ হয়ে সুন্দর মানুষটিকে ছেড়ে দিয়ে, তাকেই ছেঁকে ধরল। 'ও মা, তুমি আবার কখন এলে পণ্ডিত? রুমাল নেড়ে আমাদের বিদায় দিয়ে, আবার নিজেও এসে পড়লে?'

পণ্ডিত চটে গেল, 'রুমাল নেড়ে তোদের বিদায় দেব কেন রে? আমিও সঙ্গে আসব বলে আমার মেয়েকে ইসারা করলাম, তাও বুঝলি না। নাঃ, দশের বেশি গুণতে পারিস্ না, তোদের দিয়ে কোন্ কাজটা হবে, জানি না!'

ল্যাংড়া বলল, 'কোথায় তোমার মেয়ে? তাকে তো দেখলাম না।' বুড়ো আকাশ থেকে পড়ল, 'দেখলাম না কিরে! সে-ই তো উড়ো-জাহাজ চালাল। এক্ষুণি তাকে মাসি মাসি কচ্ছিলি, আবার এক্ষুণি বলছিস্ দেখিস্‌নি!'

'ওমা, ঐ তোমার মেয়ে নাকি?' 'নয় তো কি? বলি চেহারা দেখেও টের পেলি না? সবাই বলে ও অবিকল আমার মতো দেখতে। —এতে অত হাসার কি আছে শুনি? দাড়ি কামিয়ে শাদা পোশাক পরলে আমাকেও ঐ-রকম দেখতে লাগে।' ওরা কিছু না বলে এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। বুড়ো আরো বলল, 'শেষটা আসতেই হল। আবার যদি কেউ অংক ভুল করে, কাজটাকে আরো পেছিয়ে দেয়? তেরো বছর আগে যেমন করেছিল। তাতেই যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে। পৃথিবী প্রায় ফোঁপরা। আবার তেরো বছর পেছুলে বড্ড বেশি

দেরি হয়ে যাবে। তোদের দেশের পাকাকুল বেশি চুষলে কি হয় জানিস্ তো?'

গুঁপো বলল, 'বিচি সুদ্ধ্ বেরিয়ে আসে। খালি খোসা বাকি থাকে—' পণ্ডিত খুশি হল, 'বাঃ, মুখ্যুটার তো বেশ বুদ্ধি আছে দেখছি। এক দিক দিয়ে মুখ্যুই ভালো। তাদের মাথায় কাঁচা কাঁচা বিদ্যে ভরে দেওয়া যায়। আর ভুল বিদ্যে দিয়ে যাদের মগজ বোঝাই, তাদের মাথায় একটা ছোট অংকও গুঁজে দেবার জায়গা থাকে না। তাদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না। পণ্ডিতরা তো অনেক চেষ্টা করেও কিছুতে কিছু করতে পারল না। এবার মুখ্যুরা চেষ্টা ছাখ্।'

সোন তখন কাছে এসে বলল, 'আর সেই হাওয়ার দাঁড়ি, যার ওপর পৃথিবীটা ঠিকমতো ভর করে থাকে—কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে? তুমিই না বলেছিলে তাকে চোখে দেখা যায় না?'

পণ্ডিত বলল, 'তাহলে টিলার নিচে একটু বোস্। আমার লক্ষ্মী মেয়ে দিয়া তোদের জন্য গরম মিষ্টি দুধ নিয়ে আসছে, ঐ ছাখ্। একটু একটু চুমুক দে আর আমার কথা শোন্। দিয়া হল গিয়ে—দিবা হল গিয়ে পুরনো ভাষায় দেবীর নাম। তবে একটা দেবীই দেখলাম আমি, সে একটা ছোট্ট অংক, যে অংক থাকে সব অংকের গোড়ায়। তাকে বাদ দিলে কোনো অংক বাকি থাকে না। ঐ অংক দিয়েই দিনরাতের হিসাব, মহাকাশে কে কোথায় আসবে যাবে সব ঠিক করা হয়। মায় কখন ডিম ফুটবে, কুঁড়ি খুলবে—' ঐ অবধি শুনে মুংরি, চম্পা, টেমি এমনি অবাক হল যে বলবার নয়, 'এ্যাঁ! মাসি তাহলে একটা অংক?—মানুষ না? আমরা যে ধরে দেখলাম মিষ্টি নরম গরম—অংক আবার অমন হয় নাকি?' গুঁপো বলল, 'অনেক দূর গুণসে হয় তো হতে পারে।' পণ্ডিত ভারি বিরক্ত, 'আমার মেয়ে অংক হতে যাবে কেন? সোন, তোর মা কি একটা অংক?'

সোন মুখ তুলে বুড়োর দিকে চেয়ে রইল। পণ্ডিত ওকে কাছে টেনে এনে বলল, 'তেরো বছর আগে আরেকটু হলেই হাওয়ার দাঁড়িতে হাত পড়ত আমাদের। সেই সময়ে দিয়ার কোল থেকে মেটে ভালুক তার এক মাসের ছেলে তুলে নিয়ে সেই যে কোথায় চলে গেল আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ব্যস, দিয়া আর অংক কষতে পারে না। সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে নিশ্চিন্তে বসে যে অংক কষতে হয় রে। আমারো অংকটংক ভুল হয়ে গেল।' পণ্ডিত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। সোন তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'বলনা, হাওয়ার দাঁড়িটা কি রকম।'

পণ্ডিত বলল, 'মনে করতে হবে পৃথিবীর মধ্যিখান দিয়ে এপার-ওপার একটা ডাণ্ডা চলে গেছে। ঐ ডাণ্ডার ওপর বাঁইবাঁই করে পৃথিবী ঘুরছে, যেমন আলের ওপর লাট্টু ঘোরে। সে তো বলেইছি। ঐ ডাণ্ডা একটু কাৎ হয়ে থাকে। তাইতেই দিন-রাত ছোট-বড় হয়, শীত গ্রীষ্ম হয়, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তা তোরা পৃথিবীর পেট ফোঁপরা করে দিচ্ছিস্, হাওয়ার দাঁড়ি চারদিকে ওজন পাচ্ছে না, কাৎ হয়ে থাকতে পারছে না। একটু একটু করে খাড়া হয়ে উঠছে, তাই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এখনি একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে, সব্বনাশ হবে—এই জায়গাটা আগে বরফের তলায় চাপা ছিল—।'

সোন বলল, 'তাহলে গলেছে তো ভালোই হয়েছে। ডাণ্ডার মুখটার নিশ্চয় খানিকটা বেরিয়ে থাকে, তা চোখে দেখা যাক কি নাই যাক! সেইটে ধরে মোক্ষমসে নিচের দিকে টানলে কেমন কাৎ না হয় দেখব। কিরে তোরা আমার সঙ্গে আছিস্ তো?' দলের সবাই হাঁ করে উঠল, 'আছি!' এত যে পণ্ডিত অংক বোঝাল তার কিছুই ওদের মাথায় ঢোকেনি। মুখ্যু সব, দশের বেশি গুণতে পারে না, শূন্যের চেয়েও যে কম থাকে তাও জানে না। সোন যা বোঝায় তাই বোঝে, যা বলে তাই করে। তবে অংকের কথাটা সোন-ও

যে খুব বুঝেছে তা-ও নয়। খালি ওর মনের মধ্যিখানে একটু একটু মালুম দিচ্ছে যে সব সর্বনাশের ভিতরে নিরাপদে নিশ্চিন্তে একটুখানি অংক আছে, তাকে চোখে দেখা যায় না, তার নাগাল পাওয়া শক্ত, তাকে বদলানো যায় না, নষ্ট করা যায় না, তার জন্য সব হিসাব ঠিক থাকে, সবাই ভালো থাকে। সোন ভারি একটা সাহস পেল মনে।

পণ্ডিতের দিকে ফিরে জোর গলায় বলল, 'সে কোথায় আমাদের একবার শুধু বলে দাও।' পণ্ডিত বলল, 'আগে দুধ খেয়ে গায়ে জোর করে নাও।' সুন্দর মানুষটি চোঙা লাগানো চকচকে জগে করে মিষ্টি দুধ এনে একে একে গলায় ঢেলে দিতে লাগল। ওদের খিদে তেষ্টা দূর হল।

সোনের মুখে মাথায় সে হাত বুলিয়ে দিল, মনে হল তার চোখদুটি অল্প অল্প হাসছে। সোন বুড়োকে বলল, 'আমরা তৈরি, এবার বল। হাওয়ার দাঁড়ি চোখে দেখা যায় না তো জানলে কি করে যে সে কাৎ না থেকে খাড়া হয়ে যাচ্ছে?'

পণ্ডিত বলল, 'তা জানব না? লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নিয়মের এদিক-ওদিক হচ্ছে না তো, এখনই বা হবে কেন? তবে হ্যাঁ, পৃথিবীর মধ্যিখানটা ফোঁপরা হয়ে গেলে ঐ রকম ফল হতে পারে। অংক কষে আমি ঐ রকম দেখতে পাচ্ছি। তা তোদের মত মুখ্যুদের কি করে দেখাই বল? তাছাড়া সব জিনিস কি আর চোখে দেখার মতো? সুখ কি চোখে দেখা যায়? দুঃখ কি চোখে দেখা যায়? চোখ দিয়ে ও-সব দেখা যায় না, মন দিয়ে টের পেতে হয়। এও তেমনি অংক কষে আমাকে বুঝতে হয়েছে আর তোরা হলি মুখ্যু, আমার কথা মেনে নিতে হবে তোদের। নইলে কাজ হবে না।'

সোন বুড়োর দু-হাত ধরে বলল, 'আমরা মেনে নিয়েছি, গুরুঠাকুর, খালি বলে দাও কোন্ জায়গাটা দিয়ে ঐ যেটা চোখে দেখা যায় না, সেটা মাটি থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।'

পণ্ডিত বলল, 'তাহলে এসো আমার সঙ্গে। টিলার ওপর চড়তে হবে কিন্তু।' অমনি সোনের পেছন-পেছন ছুটে চলল ছেলেমেয়ের দল। টিলার ওপরটাতে একেবারে ন্যাড়া বরফ। সোন বলল, 'কোথায়? কোথায়?' টিলার মাঝখানটা একেবারে চ্যাপ্টা। পণ্ডিত সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিল। সেখানে বরফের ওপর কি জানি কি দিয়ে একটা লাল গোল দাগ কাটা।

তাই দেখে ওরা লাফিয়ে উঠল। 'ঐখান দিয়ে বেরিয়েছে নাকি?' বলে সব ঘিরে দাঁড়াল। পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আহা, আহা, কি কর, কি কর! অত কাছে যেয়ো না বলছি! মাড়িয়ে দিলে সব মুছে যাবে। তেরো বছর ধরে অংক কষে জায়গাটা ঠিক করেছি—কি কর, কি কর!'

সোন তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোরা শোন্! ঐ লাল দাগের মধ্যিখান দিয়ে হাওয়ার দাঁড়ির মুণ্ডু বেরিয়ে আছে, চোখে দেখা যাচ্ছে না। খবরদার কেউ লাল দাগ মাড়াস্নি বলছি! এবার সবাই মিলে পাকড়ে ধরে টেনে নামা দেখি—এক দুই তিন চার—সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় গড়া সেই অ-দেখা ডাণ্ডা ধরে সব কটা ছেলেমেলে ঝুলে পড়ল আর চড়-চড়-চড় করে ওরা দু-বিঘৎ নেমে পড়ল। পণ্ডিতের কি উত্তেজনা, 'ওরে ছাড়্! ছাড়্! ওতেই হবে। শেষটা একেবারে শুইয়ে দিলে সর্বনাশ!' হাত ছেড়ে দিয়ে ঝুপঝাপ মাটিতে পড়ে, ছেলে-মেয়েগুলো হাঁপাতে লাগল।

পণ্ডিত ছুটে এসে হাসতে হাসতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সবাই মিলে ঝুলে পড়বি এমন তো কথা ছিল না। কিন্তু আর ভয় নেই! এবার টাল সামলেছে মনে হচ্ছে!'

সোন এগিয়ে এল, 'ফের যদি খাড়া হয়, তখন কি হবে? আমাদের ফিরে যেতে হবে। গাধা নিয়ে বুড়োদাদু আর আমার মা বেঁটেদের বনের ধারে আমাদের জন্য বসে আছে।'

পণ্ডিতের মেয়ে দিয়াও কখন ওপরে উঠে এসেছে। সোনের পিঠে

হাত রেখে, নরম গলায় বলল, 'তোমার মা? সেখানেও তোমার মা আছে নাকি?' ছেলেমেয়ের দলকে পায় কে! 'আছে, আছে, আমাদের গাঁয়ে। ওর সত্যি মা নয়। বুড়ি, দাঁত নেই, চুল সাদা, কুঁজো হয়ে হাঁটে! ভীষণ সাহস! অন্ধকার বেঁটেদের বনে রাত দুপুরে একলা গিয়ে গাছতলা থেকে ওকে তুলে এনেছিল। ও বেঁটেদের ছেলে। ওর কপালে বেঁটেদের আঁচড়ের দাগ। ওর বাবাও নেই।'

চোখের জল মুছে, সোনকে জড়িয়ে ধরে, দিয়া বলল, 'না। ও আমার ছেলে।' পণ্ডিত বলল, 'ওর বাবাকেও দেখতে পাবে।' সোন দিয়ার মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রথমে কিছু বলতে পারছিল না। ওর চোখেও জল দেখে ছেলেমেয়েগুলো অবাক। শেষে সোন বলল, 'সে-ও আমার মা। আমি না খেলে খায় না। আমার অসুখ করলে ঘুমোয় না। আমি খুশি হলে খুশি হয়। আমার দুঃখ হলে কাঁদে। সে আমার মা নয় তো কে?' দিয়া বলল, 'হ্যাঁ, সোন, সে-ও তোমার মা।'

IIIIIII

পণ্ডিতের আর তর সয় না। ‘এই রে! পেন্সিলটা আবার পড়ে ভেঙে গেল। দে তো ছুঁচলো করে।’ সোন পেন্সিল ছুঁচলো করতেই বুড়ো বলল, ‘দেখ্ বাপু, এখানে বসে থাকলে তো চলবে না। পৃথিবী যাতে আবার ভরাট হয় তার কি ব্যবস্থা করেছি, দেখবিনে?’ অমনি সবাই এক পায়ে খাড়া।

‘কেমন করে যাওয়া হবে? চারদিক যে লেপাপোঁছা, পথের চিহ্নটুকু নেই!’ ‘নেই আবার কি? মাথার ওপর আকাশ আছে না? তার দিগন্তের চারদিকে বাঁকা হয়ে সূর্য ঘোরে না? তাকে ২০ ঘণ্টা দেখা যায়, ৪ ঘণ্টা দিগন্তের নিচে নেমেও আলো দেয়।’

‘তাহলে আর ভাবনা কিসের! চল চল চল চল!’

কাচের ফড়িং তৈরি। শাদা পোশাক পরা চালক-মা তৈরি। আরো তিন জন শাদা পোশাক পরে তৈরি। ব্যাগ বগলে পণ্ডিত গিয়ে খচ্ মচ্ করে আগে বাগে উঠল। তাড়াহুড়োয় পেন্সিলটা পড়ে গিয়ে আবার ভেঙে গেল। আবার, সোন সেটি ছুঁচলো করে দিল। তারপর যে যেখানে পারে চেপে বসল। ফড়িং কখন আকাশে উড়ল এতটুকু জানান দিল না। খালি নিচে দেখা গেল শাঁইশাঁই করে আরেকটা কাচের ফড়িং-ও মাটির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

দু-ঘণ্টা উড়ল। পণ্ডিত বলল, ‘তেল লাগে না এই উড়োজাহাজে। সূর্যের তেজে চলে। আমার প্রাণের বন্ধু বড়লামা, যে অনেক দিন আগে প্রথম বাতাস-বাড়ি তৈরি করে শূন্যে ভাসিয়েছিল—’ ছেলে-মেয়েরা তো অবাক। ‘কেন, শূন্যে বাড়ি কেন? তাহলে ওরা জল

পাবে কোথায়?' পণ্ডিত ভারি বিরক্ত, 'ও মা! মুখ্যুগুলোকে কি বলে বোঝাই! দশের বেশি গুণতে পারে না, এরা বুঝবে কতটুকু!' এবার সোন বলল, 'বুঝবে, বুঝবে। তুমি বলই না। তুমিই কি সব জান? বাবুইপাখি বাসা বুনবার সময় যেদিক থেকে ঝড় আসবে, তার উল্টো দিকে ভেতরে ঢুকবার পথ করে, এ-সব তুমি জানতে?'

বুড়ো হেসে ফেলে মাথা নাড়ল। বাবুইপাখি দেখেইনি সে। তবু পণ্ডিত বলল, 'আমি বুঝি অংক। বাবুইপাখি কিছু অংকের বিষয় নয়।' সোন মানতে চায় না, 'সব কিছুর গোড়ায় যখন সেই তোমার ছোট্ট অংকটা, যা দেবতারি আরেকটা নাম-ও হতে পারে, তাহলে সে-ই অংকটাই বাবুই পাখির ডিম পাড়ার, ডিম থেকে বাচ্চাফুটে বেরুনোর সময়, সেই সময়ে ঝড় আসার নিয়ম করার, আর সেই ঝড় ঠেকাবার জন্য উল্টো দিকে বাসার দরজা করারো কারণ!'

পণ্ডিতের মুখে কথা সরে না! ঠিক সেই সময়ে আকাশে ওড়া কাচের ফড়িং আর মাটিতে ছোটো কাচের ফড়িং দুটো এ-ওর কাছাকাছি এসে এক হয়ে গেল। উড়োজাহাজ মাটিতে নামল। কাচের দরজা খুলল। কাচের সিঁড়ি নামল। অবিশ্যি সত্যিকার কাচ নয়। কাচ তো ভেঙে যায়। এ সহজে ভাঙে না। কারো মুখে কথা নেই। এ কোন্ রাজ্যে এসে পড়েছে ওরা। এমন জায়গা যে পৃথিবীতে আছে তাই বা কে জানত!

সুড়সুড় করে সবাই নামতে লাগল। নামার আগে পণ্ডিতের হাত থেকে পেন্সিলটা সোন টেনে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। বুড়ো চমকে উঠল, 'অ্যাঁ, এ কি? আচ্ছা, তুই-ই রাখ্।' চারদিকে ওরা চেয়ে দেখে অদ্ভুত দৃশ্য। মধ্যিখানে খানিকটা খোলা জায়গা, মোলায়েম পাথর না কি দিয়ে বাঁধানো। সেইখানেই উড়োজাহাজ নেমেছে। চারদিকে তার কিছু দূরে দূরে, গোল করে সাজানো থাম্বা রয়েছে। থাম্বার ওপরে শূন্যে উড়ছে একটা করে কি যেন, সে যে বাতাস-বাড়ি

তা আর কাউকে বলে দিতে হল না। সেই সব বাতাস-বাড়ি থেকে হাসতে হাসতে থাম্বার গায়ে কাটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল দলে দলে ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি। তাদের মধ্যে একজনকে দেখে 'তুলে!' বলে ছুটে গেল পণ্ডিত। 'এই দ্যাখ্ আমার প্রাণের বন্ধু তুলে! ওর কাছেই আমি অংক শিখেছি। ও-ই এই সব বাতাস-বাড়ি, যেখানে বাতাস থেকে জল তৈরি হয়—ঐ উড়োজাহাজ, যা সূর্যের তেজে চলে—ঐ যে শাদা পোশাক দিয়ারা পরে, যা আগুনেও জ্বলে না—এই সমস্তর নিয়ম বের করেছে। ও-ই আমাকে সেই সব-কিছুর গোড়াকার ছোট্ট অংকটার কথা শিখিয়েছে। নমো যদি করতে হয় তো ওকেই কর।' তাই শুনে ওরা সবাই চ্যাপ্টা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে তুলেকে নমো করল।

মাটিতে শুতেই টের পেল এতো সেই বরফের রাজ্য নয়। এখানকার মাটি ঠাণ্ডাও নয়। চারদিকে কেমন সবুজ ঘাস, ফুলগাছ, ফলগাছ। সূর্য কেমন মাঝ-আকাশে। অবাক্ হয়ে সব এ-ওর দিকে তাকাল। তুলে তখন ডেকে বলল, 'ওরে নরবু, শামু, বলবীর, পদম, পম্পা, কাঞ্চী, জ্যেঠি, বাহাদুর, সুখ—অ—ন, তোরা যারা এখানে আছিস্, এদের যত্নআত্তি কর্।' সঙ্গে সঙ্গে লাল লাল গাল, মাথায় বেশি লম্বা নয়, পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পাঁচ ছয়জন মানুষ এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা আছি, বড়লামা, বাকিরা কাজে গেছে। তা তোমরা আমাদের সঙ্গে এসো। বাতাস-বাড়ি কেমন হয় দেখনি বোধ হয়?'

সিঁড়ি বেয়ে সবচেয়ে বড় বাতাস-বাড়িতে ওরা উঠে গেল। নিচে থেকে পণ্ডিত ডেকে বলল, 'আমার খাবারটা নিচে দিয়ে যাস্। আমার আবার ড্যাঙা ছেড়ে ওপরে উঠলেই মাথা ঘোরে। তাই উড়োজাহাজ-টাহাজে চড়তে পারিনে।' এমন অদ্ভুত কথা শুনে বনগাঁর ছেলেমেয়েরা হাঁ। বাতাস-বাড়িতে একজন সোনালি চোখ, সোনালি রং, রোগা লম্বা শরীর, মানুষের সঙ্গে দেখা। পদম, পম্পারা খুশি হয়ে

বলল, 'বাঃ, খুব ভালো হল। তোমরা খাবারদাবার খাও, পাদ্রী তোমাদের ওর বই থেকে গল্প বলুক, আমরা কাজে যাই।'

সে যে কি ভালো খাবার তা বলা যায় না। নরম পাঁউরুটি দিয়ে, মাখন দিয়ে, মধু দিয়ে খেল ওরা। নুন, গোলমরিচ দিয়ে ডিমসিদ্ধ খেল, এক পেয়ালা করে দুধ খেল। বাতাস-বাড়ির পেছন দিক থেকে পদমরা ঐসব এনে দিল।

লম্বা বেঞ্চি, সামনে লম্বা টেবিল। টেবিলের এক মাথায় পাদ্রী এসে বসল। তার মুখময় হাসি। ঠোঁটের দুই কোণ দিয়ে, মিটমিটে সোনালি চোখ দিয়ে সেই হাসিটা ফেটে পড়ছিল। জোব্বার পকেট থেকে একটা বই বের করে সেটি না খুলেই, পাদ্রী বলল, 'বহুকাল আগে ন্যাজারেথ্ বলে একটা গ্রামে, জোসেফ্ বলে একজন ছুতোর ছিল। তার স্ত্রীর নাম ছিল মেরি।' সোন আর চুপ করে থাকতে পারল না—'তাদের ছেলের নাম যীশু। তাকে দেখেছ তুমি? আমার বুড়োদাদুকে মিলিংটারি পাদ্রী বলেছিল যীশুকে পেলে আর কিছুর দরকার থাকে না। কোথায় নাকি মস্ত মস্ত মন্দির আছে। সেই মন্দিরে যীশুর মা-বাবা, যীশু সবাই পুজো পায়। সেই মন্দিরে একবার গিয়ে আমাদের বনগাঁয়ের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে আসি। জান কোথায় সে মন্দির?'

পাদ্রী বইটা আবার পকেটে ভরে বলল, 'এইখানে।' শুনে সবাই অবাক! 'এইখানে? কোথায়? কোথায়?' এখানে কোন মন্দির তো দেখা যাচ্ছে না, পাদ্রী হাত মেলে চারদিকে দেখিয়ে বলল, 'কি জানি, তাকে কি মন্দিরে বন্ধ করে রাখা যায়? তোরাও যেমন! ঐ সব মন্দিরে যারা পুজো করে, তারা কেউ তো তাকে খুঁজে পায়নি। লড়াই করে, বোমা ফেলে, মানুষ মারে। বরং বাইরে খুঁজে দেখতে পারিস।' উঠে পড়ল পাদ্রী, 'অংক-টংক শিখলে কিছু সুবিধা হতে পারে। আপাতত আমার সঙ্গে চল্ তো, কিছু কাজ দেখাই। তারপর দিয়া তোদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কোথায় বনের

ধারে কারা নাকি তোদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাসনপত্র ঐখানে কলে ধুয়ে তাকে তুলে রেখে যা, নইলে আমার বুড়ি-মা রাগ করবে। রান্নাবাড়ি সে-ই চালায়।' দেখলও বুড়ি-মাকে। বেজায় ভালো। ওদের সবার হাতে ল্যাবেঞ্চুষ দিল।

নিচে এসে ছেলেমেয়েরা বলল, 'এবার কাজের জায়গায় নিয়ে চল।'

পাদ্রী অবাক হল, 'বলে কি ছেলে! সেখানে নিয়ে যাবতো বলিনি, দেখাব বলেছি। যেতে চাস্, পরে যাবি। আমার পাঠশালায় শিখে-পড়ে তবে কাজে হাত দিবি। নেপেন পণ্ডিত বলছিল তোরা গুণতেও জানিস্ না।' সোনের ভারি আগ্রহ, 'কোথায় তোমার পাঠশালা?' 'কি মুশ্‌কিল, আগে এখানকার পাঠশালা নেপেনকে বুঝিয়ে দিই, তারপর সটাং তোদের বনগাঁওতে পাঠশালা খুলব। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি সবাই পড়বে, কি বলিস্?' শুনে সকলের ফুর্তি কত।

বেশি দূরে যেতে হল না। পায়ে হেঁটেই গেল ওরা। দূরে ঝাউ গাছের নিচে হরিণের পাল দেখতে পেল। তাদের ডালপালাওয়ালা শিং। পাদ্রী বলল, 'ওরা বল্‌গা হরিণ। শীতের সময় বরফ পড়ে, তখন ওরা বরফ গাড়ি টেনে আমাদের এদিকে ওদিকে নিয়ে যায়। অনেক জায়গায় আমাদের কাজ হয়।'

যেখানে গিয়ে পৌঁছল, সেখানটা চারদিকের জমি থেকে অনেক উঁচু। নিচে বহু দূর অবধি দেখা যায়। পাদ্রী ঝুলি থেকে অনেকগুলো অদ্ভুত চুঙির মতো যন্ত্র বের করে ওদের দিয়ে বলল, 'এগুলো বড়-লামার তৈরি দূরবীন। চোখে লাগালে অনেক দূর অবধি দেখা যায়।'

চোখে লাগিয়ে ওরা পড়ে যায় আর কি! মনে হল পায়ের কাছে হাজার হাজার লোক আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি আর বিশাল বিশাল উড়োজাহাজ আর সে কি ছুটোছুটি, চাকার ঘোরানি, উড়োজাহাজের ওঠা নামা! আরো ভালো করে দেখল, ওখানকার

জমির মধ্যিখানটা ঢালু হয়ে নেমে গিয়ে মনে হল একটা গর্তপানা জায়গায় শেষ হয়েছে। আর যত উড়োজাহাজ আর খুদে রেলগাড়ি আর ঠেলাগাড়ি আর ঝাঁকা-মাথায় সারি সারি লোক, তারা একটা ঢালু জায়গায় পাহাড় পাহাড় কি যেন ফেলছে আর সেগুলো গড়িয়ে ঐ গর্তে ঢুকে যাচ্ছে! একের পর এক ফেলছে তো ফেলছেই, দেখে ওরা থ!

'কি ফেলছে বলতেই হবে, পাদ্রী, কি হচ্ছে ওখানে!' পাদ্রী আশ্চর্য হল। 'ওমা, তাও বুঝলি না? পৃথিবীর ফোঁপরা পেট ভরাট হচ্ছে। যেখানে যত ফেলে-দেওয়া জিনিস আছে, সব জড়ো করে এনে ওখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ওটা একটা নিবে যাওয়া আগুন-পাহাড়। যেখানে যত ফুরিয়ে যাওয়া খনি আছে, তাও ভরাট করা হবে। সারা ছুনিয়া সাফ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর চাপ খেয়ে আর ভেতরের গরম লেগে ঐ রাবিশ্‌গুলোই আবার তেল হবে, ধাতু হবে, গ্যাস হবে, সব অভাব দূর হবে।'

পাদ্রী খুব হাসতে লাগল। সোন বলল, 'তাহলে কি দিয়ে গাছের সার হবে? সব যদি তোমরা নিয়ে আস?' পাদ্রী একটু বিরক্ত, 'আরে সব কি আনা যায়? সারের জন্য রেখে বাকিটা আনব। আর দেখ, আমাকে অত জিগগেস্‌ ক'রো না, আমি অত উত্তর জানি না। নেপেন পণ্ডিত আর বড়-লামা বই লিখেছে, ভালো করে পড়তে শিখো, তাহলে সব উত্তর পেয়ে যাবে। তুমি দিয়ার হারানো ছেলে, পণ্ডিত তোমার দাদামশাই। আশা করি সেটা জান।'

সেটা জানে সোন। কিন্তু বেঁটেদের বনের ধারে দাঁত পড়া, চুল পাকা, রং কালো যে বুড়ি রয়েছে, সে-ও তার মা। সব দেখা হলে, ওরা আবার হেঁটে বাতাসপুরে ফিরে এল। কাচের ফড়িং তৈরি। এবার দেশে ফেরার পালা। বড়-লামার কাছে বিদায় নিয়ে, সবাই গিয়ে উড়োজাহাজে উঠল। পণ্ডিত, পাদ্রী, ছুজনেই সঙ্গে গেল। হেসে কেঁদে বিদায় পর্ব চুকল। কাচের ফড়িং আবার বাতাস নিল।

এবার আর সুড়ঙ্গ দিয়ে নামা নয়। গর্তে ঢুকতে পাদ্রী একেবারে নারাজ।

উড়োজাহাজ নামল পেমি-পেমাদের গাঁয়ের বড় গুম্ফার বিশাল চাতালে। বং—বং—বং—বং করে ঘণ্টা বাজছিল। ওরা নামতে না নামতে থেমেও গেল। পেমি-পেমা, ওদের মা আর লামা হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল। পণ্ডিত সোনকে ডেকে বলল, 'ও হ্যাঁ, তোকে বলতেই ভুলে গেছি, ওকে তোরা লামা বলিস্ কেন? ও মোটেই লামা নয়। ও হল গিয়ে পরম পণ্ডিত। আমার নিজের ছাত্র। ও-ই তোর বাবা। নমো কর। দিয়া! কোথায় গেলি মা, তেরো বছর আগে বলিনি তোকে, ঐখানে কাজ শুরু হলে পর তোর ছেলে খুঁজে দেব! ঐ ছাখ্, দিলাম কিনা!'

এর পর আর কতটুকু বলার কতটুকু বাকি থাকে। ওরা দল বেঁধে, গান গাইতে গাইতে, পাহাড়ি পথ বেয়ে নামতে লাগল। ততদিনে আবহাওয়া পাল্টে গেছে, দু-দিন বৃষ্টি হয়েছে, ছাগল-ভেড়া অনেক ফিরে এসেছে। গাঁয়ের লোক বেঁটেদের বন অবধি গিয়ে আর নামেনি। দাদাঠাকুর, মা, মোড়ল, টাট্টু দেখে মনে সাহস পেয়েছিল। তারপর একে-দুয়ে গাঁয়ে ফিরেছিল। খালি পেমা-পেমির জ্যাঠা আর পুরুত তার পরিবার নিয়ে বনগাঁওতে থেকে গেছিল। মোড়ল তাদের চাকরি দেবার লোভ দেখিয়েছিল। মন্দির ছেড়ে পালানোর জন্য দেবতার ভয়ও ছিল মোড়লের। বনের ধারে বড়ঠামুরা তখনও বসে ছিল। দিয়াকে লামাকে দেখে ভালোবেসে ফেলল।

পরে সুড়ঙ্গের ওপরে বিজ্ঞান-বাড়ি হল, সুড়ঙ্গের আগাগোড়া সিঁড়ি হল। বিজ্ঞান-বাড়িতে সোনের মা-বাবা কাজ করত। সোন বনগাঁওতে পাদ্রীর পাঠশালায় পড়ত, ছুটিতে বিজ্ঞান-বাড়ি যেত আর বাকি সময় আগের মতো বড় ঠাকুমার কোলের কাছটিতে থাকত। বড় হয়ে সে-ও বিজ্ঞান-বাড়িতে পড়তে গেছিল। সেখানে তখন মস্ত বিদ্যালয়।

যে যার যথাস্থানে যাবার আগে অন্য হাঙ্গামা চুকলে, বন-দেবতার মস্ত উৎসব হল। আবার ঝরণায় জল ছুটেছে, গাছে ফুল ফুটেছে, চারার শেকড় লেগেছে, গোরু-ছাগল বাচ্চা দিয়েছে, বুনো হাঁসরা দেখা দিয়েছে। এমন সময় বড়ঠামু হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ রে, সব বললি, গুহাঘরের বাবাঠাকুরের কাছ থেকে উপায় করেও এলি, কিন্তু তাকে কেমন দেখলি কই, তাতো বললি না? সে কি তবে দেখা করেনি, শুনেছি বেজায় রাগী?' পণ্ডিত তখন গলা খাঁকরে বলল, 'আছে, দিদি, আছে। একেকজন দশ বছর ডিউটি দেয়। তারপর আরেকজন পণ্ডিত আসে। আমিই এখন বাবাঠাকুর হয়েছি বলতে পার।' অমনি বড়ঠামু লাফিয়ে উঠে বলল, 'অ্যাঁ, তাই নাকি? ওরে তোরা নমো কর, নমো কর। বনদেওয়ের নিজের ছেলে যে পণ্ডিতরা।' সবাই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। দিয়া তো হাঁ!

—*—

বিত্তালয়

ঘুড়ি

পুরনো এক ঝড়ঝড়ে বাড়ি। তার মধ্যে পানু আর পানুর কাঠ-খোদাই—আসবাব মেরামতির ব্যবসা আর পানুর সাতটা অনাথ ছেলে। তাদের কেউ ভেসে এসেছে বানের জলে, কেউ বা পথ থেকে কুড়িয়ে আনা। সবার বড় সোম, তার ১৫ বছর বয়স, তারপর মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি করে, সবার ছোট রবি, তার বয়স তিন। ঐ হল পানুর কোল-পোঁছা ছোট ছেলে, পারলে দিনরাত বাপের কোলেই বসে থাকে। তাকে তিন মাস বয়সে পানু ডাস্টবিন থেকে তুলে এনেছিল। সে-ই হল ছয় দাদার চোখের মণি। একটা চোখ কানা, অন্য চোখে দশ চোখের দৃষ্টি। ছড়া বাঁধে।

পানু বলে আগে নাকি এ অঞ্চলে ওর পূর্বপুরুষদের ভারি নামডাক ছিল। এখানে কাউকে মল্লিকবাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে সবাই পানুর পাঁজরা-খসা আধা-ইঁট আধা-কাঠের বাড়িটে দেখিয়ে দেয়। যদিও আড়ালে বলে—ওর পূর্বপুরুষদের বাড়ি না ছাই! ওর ঠাকুরদার ঠাকুরদা মল্লিকদের লেঠেল-সরদার ছিল।

তা অবস্থা পড়ে গেলে মালিকরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। শেষ মালিক এক খ্যাপা বৈজ্ঞানিক, তিন কুলে তাঁর কেউ ছিল না মরার সময় এই বাড়ি আর বাড়ির লাগোয়া দুই বিঘে জমি পানুর বাবা গেনু সরদারকে তার প্রভুভক্তির স্বীকৃতিস্বরূপ লেখাপড়া করে দান করে গেলেন। মোট কথা বর্তমান মালিক যে পানু, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ও-ই বছরে বছরে দেড় টাকা খাজনা দেয়। তার কাঠ-খোদাইয়ের কারবার মন্দ চলে না। কলকাতা থেকে ফরমায়েস আসে,

ভালো টাকা পায়। আর আসবাব মেরামতির তো কথাই নেই। বলা যেতে পারে ঐ ভাঙাচোরা আসবাবগুলোই ওদের খাওয়ায় পরায়।



তারপর সেই ভয়ংকর রাতটা এল

আসলে পান্নু হল শিল্পী। খ্যাপা বৈজ্ঞানিক বুড়োকর্তা সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহলই নেই। বুড়ো স্বর্গে গেলে, তিনতলার ছাদের চিলেকোঠায় তাঁর গবেষণার জিনিসপত্রগুলোকে সেই যে গেন্নু তালাবন্ধ করে রেখেছিল, পান্নু এক দিনও তা খুলে দেখেনি। গেন্নু ছিল আকাট

মুখ্যু, কিন্তু তার বড় সাধ ছেলে লেখাপড়া শিখে বৈজ্ঞানিক হয়ে বুড়োকর্তার মান রাখবে। তাই চিলেকোঠার চাবিগাছি আর বুড়ো-কর্তার নিজের হাতে আঁকজোখ করা খুদে একটা খাতা সঙ্গে করে এনে নিজের পুরনো ইস্টিলের তোরঙ্গে তুলে রেখেছিল।

তা ছেলেটা কেবল নরুন দিয়ে যেখানে সেখানে ফুল ফোটায়, হরিণ ছোটায়, পাখি ওড়ায়। ছেনি দিয়ে কুরে-কুরে মশলা-বাটার শিলটিকে কোন্ ফাঁকে বানিয়ে ফেলল একটা জাদুকর! নিশ্বাস ছেড়ে গেনু চাবি আর খাতার কথা ভুলেই গেল। বাঁচেওনি খুব বেশি দিন। তোরঙ্গটা এখন পানুর সম্পত্তি। তার মধ্যিখানে পুরনো লাল শালুতে বাঁধা খাতাটি তেমনি আছে। বাবাকে মনে করে পানু মাঝে মাঝে সেটি মাথায় ঠেকায়। চাবিটা যে কোথায় হারিয়ে গেল, পানু খুঁজেই পায়নি।

সাত ছেলের কারো ওদিকে মন নেই। তারা বড় ভালো। একটু দুরন্ত, কিন্তু ভারি চালাক চট্‌পটে। ছোট দুটো বাদে সব কটা গাঁয়ের পাঠশালা শেষ করে সরষের বড় ইস্কুলে যাবে, পাশ দেবে, ইস্কুলমাস্টার হবে, একটা হয়তো বৈজ্ঞানিক হবে। বুড়োকর্তার নাম রাখবে। পানু এইসব স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। ছেলেগুলো চমৎকার মেরামতির কাজ করে, হাঁসমুরগি পোষে, মাটি কোপায়, সবজি তোলে, রাঁধে বাড়ে, পুকুরে মাছ চাষ করে।

বাপ ভারি কড়া। ভোরে কারিগরি, দিনে পাঠশালা, বিকেলে দৌড়ঝাঁপ, মাটি-কোপানো আর রাতে পড়াশুনো। মঙ্গল-বুধের খাসা গানের গলা; হরি ওস্তাদ নিজে এসে ডেকে নিয়ে যায় ছুটিছাটায়। অন্য লোকের গাছের একটা কাঁচা আমে হাত দিলে পানু ছেলেদের বেতিয়ে লাল করে। নইলে গায়ে হাত তোলে না। আদর করে যথেষ্ট। চারবেলা সাদাসিধে খাবার পেট ভরে খায় সবাই। তাগড়া শরীর সব কটার। বাপ ছাড়া কিছু জানে না। এর দশ বছর আগে নৌকো করে বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ঝড়ে-ডোবা বৌ-ছেলের

দুঃখ পানু এদের নিয়ে ভুলে থাকে। এখন চল্লিশ বছর পার হল তার, চুলে পাক ধরেছে।

বুড়ো হতে আর খুব বেশি বাকি নেই। তাই মাঝে মাঝে ভয় হয়। সোম-মঙ্গলকে ডেকে বলে, 'ওরে, হঠাৎ যদি আমার কিছু হয় ছোটগুলোকে দেখিস্, বাপ।' সোম-মঙ্গল চটে যায়, 'দেখব, দেখব। না দেখে উপায় আছে।' মন্দ নয় ছেলেগুলো। মনে দয়ামায়াও আছে। তা পড়াশুনায় মন থাক বা না-ই থাক, করে খেতে পারবে নিঃসন্দেহে। ওস্তাদ কারিগর সবাই।

এর মধ্যে একটা অমাবস্যার রাতে দারুণ ঝড় হল। মুরগিদের সব ঘরে তোলা হল। কী ভয় তাদের! ঝড় থামলে কোন্ ফাঁকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বুধ গেল গঙ্গার ঘাটে, ঝড়ের দাপটের ফলাফল দেখতে। সেখানে একটা নরম কিসে পা পড়তে হাতড়ে দেখে একটা মানুষ। তাকে কাঁধে তুলে বাড়ি নিয়ে এল।

একটা ১২-১৩ বছরের কালোপানা ছেলে; কাগভেজা। পরনে একটা কালো ইজের। না চায় চোখ, না বলে কথা। কপালে একটা বড় কালশিটে। কিছুর বাড়ি লেগেছে নির্ঘাৎ। অগ্যেন, অচৈতন্যি।

পানু ঘাবড়াল না। আটজনের জায়গায় না হয় ন-জন খাবে। কাজও করবে ন-জন। শুকনো গামছা দিয়ে গা-মাথা রগড়িয়ে শুকনো ইজের পরিয়ে চামচে করে গরম দুধ খাওয়াতে যদি বা জ্ঞান হল, তা সে নিজের নামটি বলতে পারে না। সব কথা ভুলে গেছে। বুধ বলল, 'তা হলে ওর নাম রাখা হোক অমাবস্যা, কি বল বাবা।' সেই নাম-ই রইল।

ক্রমে তার শরীর সারল। চালাক চতুর, চট্‌পটে। কিন্তু ১২/.৩ বছরের ছেলে লিখতে পড়তে জানে না। বুধ রেগে বলল, 'তাও ভুলেছিস্?' অমাবস্যা এক গাল হেসে বলল, 'হ্যাঁ।' বুধ বলল, 'সেটি হচ্চে না। তোকে পাঠশালা নিয়ে যাব।' তা পাঠশালায় এমনি অশান্তি করে এল যে হাত জোড় করে পণ্ডিত বলল, 'মাপ কর বাবা,

ওই বুড়ো ছেলেকে অ-আ শেখানো আমার বুড়ো হাড়ের কম্ম নয়।' অগত্যা সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি পালা করে ওকে অ—আ—ক—খ শেখাতে বসে। শেখাবে আর কী? ও মা! মুখ থেকে ছেলে কথা কেড়ে নেয়; ৫ বছরের পড়া ৫ মাসে শেষ। আগে কোথায় কোন্ ভুলে-যাওয়া গ্রামের মাস্টারের কাছে শেখা শক্ত শক্ত অঙ্ক মনে পড়ে যায়। ময়দার ঠোঙা নিয়ে ইংরেজি খবরের কাগজের টুকরো থেকে খবর পড়ে মানে বুঝে ফেলে। তবু সে গাঁ কোথায় জানে না, মাস্টারের কথা কিছু মনে পড়ে না।

পানুর চোখ দিয়ে জল পড়ে। কোন্ পণ্ডিতের ছেলে গো, সব হারিয়ে আকাট মুখ্যু গেনু লেঠেলের ছেলের ঘরে এসে জুটেছে। ওর মাথায় হাত বুলোয়। বুড়োকর্তার ছেঁড়া বইপত্র যে-কটি বাকি ছিল, জড়ো করে এনে দেয়। অমাবস্যা জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বুড়োকর্তা কী নিয়ে গবেষণা করত, বাবা?' 'তা তো বলতে পারি না, বাপ। অঙ্ক কষত, মাপজোক করত, একটা খাতায় লিখত। আমার বাবাকে ডেকে ছাদে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াত।'

অমাবস্যা তাই শুনে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল, 'অ্যাঁ, বল কী! এত বড় পণ্ডিত, তা সে ছোট ছেলের মতো ঘুড়ি ওড়াত! খ্যাপা নাকি?' পানু চটে যায়, 'কেন, তাতে হয়েছেটা কী? তুমিও তো সোমের খাতার বড় বড় অঙ্ক কষে দাও। ইংরিজি পড়ে দাও। তবে আবার অমন দস্যিপনা কর কেন? নারকেল গাছে চড়ে পাখির ডিম পেড়ে আন কেন? পায়ে দড়ি ফাঁস না লাগিয়ে নারকেল গাছে চড়ই বা কী করে?'

অমাবস্যা পকেট থেকে সদ্য পাড়া তিনটে ডিম দেখাতেই পানু তেরিয়া হয়ে উঠল, 'তোর লজ্জা করে না মা-বাপের কাছ থেকে ডিম তুলে আনতে? যা, এক্ষুনি রেখে আয়।'

বাপের চোখ লাল। তাড়াতাড়ি আবার নারকেল গাছের মগডালে চিলের বাসায় ডিম রেখে আসে অমাবস্যা। মা চিল ফিরে এসে,

পা দিয়ে ঠেলে ডিমগুলোকে নিচে ফেলে দেয়। ভেঙে চৌচির হয়ে যায়।

সোম বলল, 'মানুষ ছুঁলে পাখিরা সে ডিম নেয় না। হয়তো বদ গন্ধ পায়।' বুধ বলল, 'ঠিক তাই। তোর হাতে বদ গন্ধ।' যত না ওদের কথা শুনে, তার চেয়ে বেশি ভাঙা ডিম দেখে অমাবস্যা কেঁদে ভাসাল। পান্নু তার ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কত আদর করল। ছেলেগুলোর বাপও পান্নু, মাও পান্নু!

অমাবস্যাকে বলল, 'ওইসব দুরন্তপনা ছেড়ে দে বাপ। তোকে বুড়ো কর্তার ঘুড়ি বানাবার খাতাটে দেব।' সব ছেলেগুলো অবাক হল। 'সে আবার কোথায়? ঘুড়ি বানিয়ে বুড়ো করত কী?' পান্নু মাথা চুলকিয়ে বলে, 'তা ঠিক জানি না। তবে আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, চীন-দেশে যাবি তো বল্। ঘুড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যাব। তাহলে কিন্তু এখন থেকেই আরশুলো খাওয়া অভ্যেস করতে হবে! আমি তাই শুনে ওয়াক্ ওয়াক্ করতে করতে পালাতাম।'

অমাবস্যা বলে বসল, 'আরশুলো নয়, ও এক রকম বিনের রস। সে খাতাটে দাও। আর চিলের ডিম নেব না।' তখন তোরঙ্গটি খুলে লাল শালুতে বাঁধা পুঁটলি বের করে, বাঁধন খুলে খাতাটি বের করে দিল পান্নু। পাতায় পাতায় লেখা, ইংরিজিতে, বাংলায়। ছোট ছোট ছবি আঁকা। বোধ হয় ঘুড়ির। গোল ঘুড়ি। আলাদা করে দোলনার ছবি। মাপ জোক, যন্ত্রপাতি। এই মোটা খাতা, তাতে সব কিছু লেখা। ভারি মলাট দিয়ে বাঁধানো। তার ওজনই হবে সেরটাক। হাতে তুলে পড়া যায় না। অমাবস্যা কোলে নিয়ে সে বই পড়ে। তখন সে চোখে আর কিছু দেখে না, কানেও শোনে না। খাবার সময় হলে পান্নু তার খাতা কেড়ে নেয়।

খাতা কেড়ে নিলেই ছেলের অন্য চেহারা। কী দুরন্ত, কী অবাধ্য। তবু একবার মুখের কথা দিলে, কথা রাখে। পান্নুকে ছাড়া কাউকে মানে না: সোম, যার ১৫ বছর বয়স, তাকেও না। সোম রেগে গেলে

অমাবস্যা বক দেখায়, জিব ভ্যাঙায়। ছেলে নিয়ে কী করবে পান্নু ভেবে পায় না। তার সদাই ভয়, এই দস্যি ছেলে কখন কী বিপদে পড়ে কে জানে। চারদিকে অন্য লোকের ফলের বাগান। তা সে ছেলে ওসব ছোঁবেও না। কিন্তু নিজের বাড়ি কম করে দেড়শো বছরের পুরনো। ফোকর, ফাটল, সাপের বাস, কাঁকড়াবিছের আস্তানা, ছাদে ওঠার সিঁড়ি নড়বড়ে, সব ইঁট আল্‌গা হয়ে আছে। কোন সময় না সবসুদ্দ্ ধসে পড়ে!

চোখ পাকিয়ে পান্নু বলে, 'ওপরে যাওয়া বারণ। ঐ সিঁড়িতে পা-টুকু দেওয়া পর্যন্ত বারণ। এই আমি বলে দিলাম।'

কোল থেকে বই নামিয়ে অমাবস্যা বলল, 'ও মা! বাবা কী যে বলে! চিলে কোঠায় না গেলে বুড়োর ঘুড়িটি দেখব কী করে? সে যে সারা জীবন ধরে ঘুড়িটে বানাল, তা কি একবার ওড়ানোও হবে না?'

পান্নুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এই সব্বনেশে ছেলে আবার না কী ফ্যাসাদ বাধায়। দশ বছর আগে যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন আর কোনো দুর্বিপাক সইতে পারবে না পান্নু। অমাবস্যাকে ঠেকাতে চেষ্টা করে, 'কী যে বলিস্, বাপ! একটা খালি ঘরে বুড়োকর্তার পরখ করার জিনিস দিয়ে ঠাসা। ওসব নষ্ট করলে সব্বনাশ হবে! বুঝবিও না কিচ্ছু।' অমাবস্যা বলে, 'তাই না আরো কিছু! সে বুড়ো কবে স্বর্গে গেছে, তার জিনিস সব উইয়ে খাচ্ছে আর আমি একটু দেখলেই সর্বনাশ হবে? যাই বল, আমি দেখবই।'

পান্নু রেগে কর্কশ গলায় বলল, 'ঘরের দরজায় আধ সেরি তালা দেওয়া। তার চাবিটেও কোন্ কালে হারিয়ে গেছে। আর দেখবি কী করে? নড়বড়ে সিঁড়িতে পা দিতে পাবি না, এই আমি মানা করে দিলাম। বাবা আর বুড়োকর্তা ছাড়া কেউ ওপরে যেত না, মানা ছিল।'

এমনি চটেছিল পান্নু যে চৌধুরীর পুরনো মেজগিন্নির খাটের ভাঙা

পায়ার বদলে নতুন পায়ার নকশা তুলতে গিয়ে পাশাপাশি দুটো মাছ সমান মাপের হল না। বাটালি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পানু মাদুর পেতে শুয়ে রইল। দুপুরে ভাত খেল না।

তখন অমাবস্যাও সেই মাদুরে বাপের গা ঘেঁষে শুয়ে বলল, 'আমিও আজ ভাত খাব না। বলছি, সিঁড়িতে পা দেব না। আধ-সেরি তালাটা ভাঙব না। এখন ওঠ দেখিনি। খিদে পাচ্ছে।'

পানুর রাগ জল হয়ে গেল। নিজেদের বাগানের কাঁচকলা, মুলো, বেগুন, মিষ্টি কুমড়ো, রাঙাআলু আর হাঁসের ডিম দিয়ে, কাঁচা লঙ্কা আর সরষের তেলের সঙ্গে মেখে, সবার সঙ্গে বসে ভাতেভাত খেল।

কথা রেখেছিল অমাবস্যা, কথা দিলে সর্বদাই যেমন রাখত। সিঁড়িতে পা দেয়নি। বাড়ির গা ঘেঁষে নারকেল গাছ। তার মাথায় চিলের বাসা, সেখান থেকে একবার ডিম নিয়েছিল সে। তবে চিলের বাসা অবধি উঠতে হয় না। তার আগেই ছাদের পাঁচিল পৌঁছে যায়। পাঁচিল থেকে তিন হাত দূরে নারকেল গাছ। সেখান থেকে এক লাফে চিলে কোঠার ছাদ। ঐ ছাদ থেকে খচমচ করে বড় ছাদে নামলে, সামনেই দেখা যায় চিলেকোঠার দরজার আধ-সেরি তালা। চাবি দিয়ে অমাবস্যা সেই তালা খুলেছিল। ঘরে ঢুকে সব দেখেছিল। এক আধ দিন নয়, প্রায় রোজ রোজ। কেউ জানতে পারেনি।

তারপর সেই ভয়ংকর রাতটা এল। দেয়ালির শেষ রাত। কোথায় আগুন প্রথম লেগেছিল কেউ জানে না। একতলার বড় ঘরে সারি সারি মাদুর পেতে নয়জন ঘুমোত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সব উঠে বসল। আগুনের হু—হু শব্দে ঘর ভরে গেছে। আগুন যে এত শব্দ করে জ্বলে, তাও ওরা জানত না। ঘর আলো হয়ে গেছে, চারদিকে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। ছুতোরের ব্যবসা, বাইরে স্তূপাকার কাঠ।

ক-দিন ধরে পানুর কোমরে বাত, চলা-ফেরা কষ্টকর। সে উঠেই রবিকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'ওরে, এটাকে কোলে নিয়ে তোরা পালা। এ বাড়ি দেশলাই বাক্স, যতটা ইট, তার চেয়ে বেশি কাঠ।

পালা! পালা! পালা! আমার জন্যে অপেক্ষা করিসনে।'

কিন্তু পালাবে কোথা দিয়ে? চারদিকে কাঠের স্তূপে আগুন জ্বলছে। সদর দরজায় আগুন। কান্নাকাটি লেগে গেল। তারি মধ্যে অমাবস্যার গলা শোনা গেল, 'ওপরে! ওপরে! ওপরে! নড়বড়ে সিঁড়ি এই একবারের মতো আমাদের ভার সইবে! ভয় নেই, সবাই বাঁচবে। ওরে সোমদা, মঙ্গলদা বাবাকে কাঁধে করে চল ওপরে!' এই বলে রবিকে তুলে নিয়ে আর মাথার কাছ থেকে বুড়োকর্তার বইটে নিয়ে, সবার আগে ওপরে ছুটল। পেছন পেছন দুদ্দাড় বাকি সব।

তিন তলার সিঁড়ির দরজায় শিকলি তোলা। রবিকে নামিয়ে অমাবস্যা শিকলি খুলল। আহা, ওপরটা কী ভালো, কী ভালো। আগুন সেখানে পৌঁছয়নি। সামনে আধ-সেরি তালা। বইয়ের মধ্যিখান থেকে চাবি বের করে অমাবস্যা চিলেকোঠা খুলল। ততক্ষণে আগুন আরো উঠেছে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে। বইয়ের মধ্যিখান থেকেই চাবিটা পেয়েছিল।

সবাই অবাক হয়ে দেখল খালি ঘরের মধ্যিখানে মস্ত একটা বস্তের মতো কি যেন ফুঁশছে, ফেঁপে উঠছে, মাটি থেকে উঠতে চাইছে। মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সেটাও সাপের মতো পাক খাচ্ছে!

সকলের কী ভয়, কী ভয়! অমাবস্যা বলল, 'ওটাকে টেনে ছাদে বের করে আন। গরম হাওয়ায় বেশি ফুলে গেলে, বেরুবে না।'

বাইরে আনতে না আনতে বুড়োকর্তার বেলুন-ঘুড়ি গোল হয়ে ফুলে উঠল। তলায় মস্ত দোলনা ঝোলা! অমাবস্যা বলল, 'আর সময় নেই, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো!'

সবাই আঁকুপাঁকু করে দোলনায় চড়তেই অমাবস্যা একটানে দড়ি আল্‌গা করে গুটিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বেলুন-ঘুড়ি ওদের নিয়ে আকাশে উঠল। একটু পরেই আগুন যখন ছাদে পৌঁছল কেউ কোথাও নেই!! দেখতে দেখতে বাড়ি পুড়ে ছাই হল।

গঙ্গার অন্য পারে খোলা মাঠ। ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। অমাবস্যা কী একটা শেকল টানল, না হাতল ঘুরোল, অমনি বুড়ো মল্লিকের আশ্চর্য ঘুড়ি বেলুন আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে স্থির হল। অমাবস্যা লাফিয়ে নেমে দড়ির মাথা গাছে বাঁধল। একে একে সবাই নেমে এল। অমাবস্যা ঝুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

এ গল্পের আর সামান্যই বলার বাকি রইল। ওই ভয়ঙ্কর রাতের উত্তেজনার জন্যেই হয় তো জ্ঞান ফিরতে অমাবস্যার আগের কথা সব মনে পড়ে গেল। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। দশ বছর আগে, গঙ্গাসাগরের কাছে জেলেরা একটা ছোট্ট ছেলেকে জল থেকে উদ্ধার করেছিল। আর কেউ বাঁচেনি। কাছেই একজন অবসরপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের ডেরা ছিল। বৈজ্ঞানিকের নিজের বলতে কেউ ছিল না। জেলেরা ছেলেটাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল। সেইখানেই মানুষ হয়। যেমন বিজ্ঞানের মাথা, তেমনি দুরন্ত। বান আসছে জেনেও সাঁতরে গঙ্গা পার হতে চেয়েছিল। সকলে ভেবেছিল বুঝি ডুবেই গেল। বুড়ো বৈজ্ঞানিকের দুঃখ দেখে কে! এক বছরে তিনি প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছিলেন। অমাবস্যা সবাইকে নিয়ে তাঁর আস্তানায় উঠতেই, তাঁর পাগলামি সেরে গেল। অমাবস্যার নাম নাকি প্রসাদ। ঐ নাম শুনে, চমকে উঠে পানু খালি বলে, 'কিন্তু ও কে? ও কার ছেলে?' তখন বুড়ো বৈজ্ঞানিক বললেন, 'এটা দেখে যদি তোমরা কিছু বুঝতে পার।' এই বলে ছোট্ট সোনার লকেট দেখালেন। ছেলেটার গলায় বাঁধা ছিল দেখেই পানু মুচ্ছো গেল। লকেটে লেখা 'প্রসাদ' আর লকেটের ভিতরে গেনু লেঠেলের রং ধোয়া ছবি! গেনুর নাতিই শেষ পর্যন্ত বেলুন ঘুড়ি ওড়াল। বলা বাহুল্য ঐ বেলুন ঘুড়ি থেকে লাখ লাখ টাকা রোজগার হয়েছিল। গাঁয়ের সম্পত্তি বেচে দেয়নি পানু। সেখানে ওর কাঠের কারবার এখনো চলছে। অমাবস্যারা কলেজে পড়ে।